ইউনিট ১: দর্শনের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও কাজ

ভূমিকা

দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মতে দর্শন জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও সমালোচনা। অপর দার্শনিক ফিক্টের মতে দর্শন জ্ঞানের বিজ্ঞান। তাই দর্শন এমন একটি ব্যাপক বিষয় যার পরিধি নির্ণয় করা দূরূহ ব্যাপার। তবে দার্শনিক মাত্রই সত্য বা জ্ঞানান্বেষী। আর দর্শন হলো সত্য উদঘটানের জন্য চিন্তার মৌলিক সূত্র হতে শুরু করে জীবন-জগতের মৌলিক প্রশ্নের যৌক্তিক ভিত্তির সন্ধান করে। এ কারণে জ্ঞানের উৎপত্তি ও স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনাসহ মূল্যবোধ, সত্যতা ও কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়াদিও এর আলোচ্য বিষয়। দর্শনের সাথে আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগসূত্র রয়েছে জীবন ঘনিষ্ঠ অন্যান্য বিষয়াদির যেমন– ধর্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জ্ঞানবিদ্যা ইত্যাদির। বর্তমান ইউনিটে দর্শনের প্রকৃতি, বিষয়বস্তু, দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি, দর্শনের সাথে জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়াদির সম্পর্ক জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিষয়বস্তু, সত্যতার মানদণ্ড, মূল্যের বিভিন্ন শ্রেণি ও কল্যাণ-অকল্যাণের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পাঠ ১.১: দর্শনের স্বরূপ ও বিষয়বস্তু

পাঠ ১.২: দর্শন ও অন্যান্য বিষয়

পাঠ ১.৩: দর্শন আলোচনার পদ্ধতি

পাঠ ১.৪: জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ জ্ঞানের স্বরূপ ও বিষয়বস্তু

পাঠ ১.৫: সত্যতার স্বরূপ ও মানদণ্ড

পাঠ ১.৬: মূল্যের স্বরূপ ও শ্রেণিবিভাগ

পাঠ ১.৭: কল্যাণ ও অকল্যাণের স্বরূপ ও সমাধান

পাঠ- ১.১: দর্শনের স্বরূপ ও বিষয়বস্তু
Nature and Content Philosophy

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দর্শনের উৎপত্তি ও অর্থ বলতে পারবে।
- দর্শনের সংজ্ঞা দিতে পারবে।
- দর্শনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দর্শনের পরিধি ও বিষষবস্তু বর্ণনা করতে পারবে।

দর্শন শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি

ইংরেজি 'Philosophy' শব্দের প্রতিশব্দ 'দর্শন'। দর্শন শব্দটি মূলতঃ সংস্কৃতি শব্দ যার পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে বস্তুর প্রকৃত সত্তা বা তত্ত্বদর্শন। সংস্কৃতি 'দৃশ' ধাতু থেকে দর্শন শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ হচ্ছে দেখা। এখানে দেখা শব্দটি তত্ত্বদর্শন বা জীবন-জগতের স্বরূপ উপলব্ধি কে বুঝায়। অন্য দিকে ইংরেজি 'Philosophy' শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ Philos এবং Sophia থেকে। Philos অর্থ অনুরাগ (Loving) এবং Sophia অর্থ জ্ঞান (Knowledge) বা প্রজ্ঞা (Wisdom)। তাই Philosophy শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞন বা প্রজ্ঞার প্রতি অনুরাগ। আর সে দিক থেকে বিচার করলে জ্ঞানানুরাগী বা প্রজ্ঞানুরাগী ব্যক্তি মাত্রই এক একজন দার্শনিক। সংক্ষেপে বলা যায় প্রজ্ঞাপ্রীতিই দর্শন, আর প্রজ্ঞা প্রেমিকই দার্শনিক। গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাস (খ্রি. পূর্ব আনুমানিক ৫৭২-৪৯৯) সে কারণেই একজন দার্শনিক হিসেবে স্বীকৃতি ও সুখ্যাতি লাব করেন। যদিও বাংলায় 'দর্শন' শব্দটি ইংরেজি 'Philosophy' শব্দটি থেকে ভিন্ন, তথাপি আলোচনার বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়ের উদ্দেশ্য জ্ঞানানুরাগ বা প্রজ্ঞানুরাগ। আলোচ্য বিষয়ের এ সাদৃশ্যের কথা বিবেচনা করেই বঙ্গভারতীয় পণ্ডিতগণ Philosophy-র বাংলা প্রতিশব্দরূপে দর্শন শব্দটি ব্যবহার করে আসছেন। তাই এতে যদি কোন মতভেদ থেকেও থাকে তাহলে অবশ্যই তা উপেক্ষণীয়।

দর্শন ও দার্শনিক (Philosophy and Philosopher)

দর্শন জ্ঞান ও সজ্ঞানুসন্ধানের এমন একটি বিষয় যার সর্বজনীন একটি সংজ্ঞা দেয়া বা এক কথায় বলা দুরূহ ব্যাপার। তবে এটা বলা যায় যে, দার্শনিক মতবাদ মানেই সেটা হবে সংশ্লিষ্ট দার্শনিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তথা সার্বিক পরিবেশ যেমন, তাঁর সামাজিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল অবস্থার একটি যৌক্তিক সমন্বয় ও পরিণতির ফসল। আর তাই দর্শন কোন স্থির বিষয় নয়; বরং তা সদা গতিময়। কেননা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে দর্শন ও পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে থাকে। তাই দর্শনের রয়েছে যুগোপযোগী ভাষ্য। দার্শনিক মাত্রই পরিবর্তনের চাকার সাথে তাল মিলিয়ে তার দর্শনকে সময়োপযোগী করে এক নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেন। ফলে যুগের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে দর্শনের ইতিহাসে অবিচার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায। সংক্ষেপে বলতে হয় যে, দর্শন ও দার্শনিক সব সময়ই গতিময়। তাই নিছক একটি সাদামাটা সংজ্ঞার মাধ্যমে দর্শনের স্বরূপ ও তাৎপর্যকে উপলব্ধি করা কখনোই সম্ভব নয়। তবে দার্শনিক রাসেল মনে করেন, দর্শন যে মৌলিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করে আসছে আবহমান কাল থেকে তার ভিত্তিতেও আমরা দর্শনের স্বরূপকে বুঝে নিতে পারি। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আমরা দর্শনের আলোচ্য সূচি ও দার্শনিকদের স্বরূপ

বিশ্লেষণ থেকেও বুঝতে পারব। যেমন, ভাববাদীগণ যেমন দার্শনিক পদবাচ্য, বাস্তববাদীগণও বহি। আবার হেগেল যেমন দার্শনিক, কার্লমার্ক্সও তেমিন দার্শনিক। তাঁদের উভয়ের মতবাদের বিরোধ থাকতে পারে তারপরও আলোচ্য বিষয় ও পদ্ধতিতে কিছু গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। তাহলো উভয় দার্শনিকই মৌলিক সমস্যা নিয়ে সর্বজনীন ও যৌক্তিক আলোচনা করেছেন। একইভাবে দর্শন বিষয়ে বলা যায় যে, ধর্মতত্ত্বের আলোচনা যেমন দর্শনের আলোচ্য বিষয়, তেমনি এ আলোচনার বিরোধিতা করাও দর্শনেরই আলোচ্য বিষয়। বিখ্যাত দার্শনিক হর্বটি সাভলীর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'Appearance and Reality' গ্রন্থেও সে বিষয়েও আলোচনা আমরা দেখতে পাই। যা থেকে দর্শনের পরিধির ব্যাপকতাই প্রমাণ করে এবং দার্শনিক মাত্রই যে উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী তারও প্রমাণ মেলে। সেদিক থেকে জ্ঞানার্জনের যে কোন শাখাকেই দর্শন বলা যায় এবং জ্ঞানার্জনের সাথে জড়িত যে কোন ব্যক্তিকেই দার্শনিকরূপে গণ্য করা যায়। আর তাই জ্ঞানের সকল বিষয়ের যেমন, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, আইনবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, সাহিত্য ইতিহাসসহ অন্যান্য বিষয়ে সকল মনিষীকেই দার্শনিক বলা যেতে পারে। দর্শনের এই ব্যাপকতার কারণেই বোধকরি যে কোন বিষয়ে যখন কেউ গবেষণা করে তা সফল হলেই 'ডক্টর অব ফিলোসফি' (Ph.D) বা দর্শন পণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সুতরাং দর্শন একটি ব্যাপক বিষয় জ্ঞানের সকল শাখাই যার অন্তর্ভুক্ত, আর দার্শনিক মাত্রই জ্ঞানার্জনে তথ্য সত্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত একজন উদারচিত্তের অধিকারী।

দর্শনের উৎপত্তি কিভাবে

দর্শনের উৎপত্তি নিয়ে দার্শনিকদের মধ্য যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কেউ কেউ মনে করেন কৌতুহল ও সংশয় থেকে দর্শনের উৎপত্তি, কেউ বা মনে করেন সত্যানুসন্ধান বা জানার আকাঙ্ক্ষা থেকে দর্শনের উৎপত্তি। আবার কেউ মনে করেন ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকেই এর উৎপত্তি। অনেকে আবার আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও পিপাসাকেও দর্শন উৎপত্তির কারণ বলে মনে করেন। নিচে দর্শনের ঐতিহাসিক ক্রমানুসরণে দর্শনের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদগুলো আলোচনা করা হলো।

সত্যানুন্ধান ও জ্ঞানস্পৃহা: দর্শনের লক্ষ্যই হলো সত্যানুসন্ধান করা। আর দার্শনিকের কাজ সভ্য অনুসন্ধানে সমস্যা চিহ্নিত করা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক ভিত্তি প্রদান করা। আর এটা মানুষের জন্মগত স্পৃহাও বটে। প্রত্যেকটি মানুষই কম বেশি সত্য জানতে চায়। সেদিক থেকে প্রতিটি মানুষই জন্মগতভাবেই দার্শনিক। কেননা জীবন-জগত এবং সমস্যা নিয়ে সব মানুষই চিন্তা-ভাবনা করে। দার্শনিক পেরীর মতে, "মানুষ কেবল প্রচ্ছন্ন একজন দার্শনিকই নয়, অংশত সে একজন সুস্পষ্ট দার্শনিকও বটে। কারণ সে পূর্ব থেকেই দর্শন সম্পর্কে চিন্তা করেছে। দর্শন তাই আকস্মিক কিছু নয়, অলৌকিক কিছু নয় বরং দর্শন হলো অনিবার্য (Inevitable) ও স্বাভাবিক (Normal)"।

বিস্ময়, সংশয় ও কৌতূহল থেকে দর্শন: মানব শিশু যখন ভূমিষ্ট হয় তখন সে ভূমিষ্ট হবার সাথে সাথেই চিৎকার করে কান্না করে। কারণ তার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা একেবারেই নতুন ও বৈচিত্র্যময়। আস্তে আস্তে সে যখন বড় হতে থাকে বাড়তে থাকে তার কৌতূহল। অর্থাৎ কৌতূহল তার জন্মগত স্বভাব। এরপর সে কখনো বিস্ময়, কখনো বা সংশয় ভরে জানতে চায় তার জীবন ও জগতকে। আর মানুষের এ কৌতূহল ও বিস্ময়ই জন্ম দেয় দর্শনের। নিত্য নতুন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেই সে ক্ষান্ত হয় না আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করে অনেক বড় কিছু। কবি নজরুলের ভাষায় বলা যায়, "বিশ্বজগত দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পরে"। বিশ্বজগতকে হাতের মুঠোয় পেতে মানুষের যে অদম্য বাসনা তা জন্ম দেয় দর্শনের।

আধুনিক পাশ্চাত্যে দার্শনিক রেনে দেকার্ত সংশয়কেই দর্শন উৎপত্তির একটি গ্রহণযোগ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর ভাষায় দর্শন মানেই যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাইকৃত ও পরীক্ষিত মতবাদ। মনগড়া কোন আলোচনা বা

অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে কখনোই দর্শন বলে অভিহিত করা যায় না। যে কারণে দেকার্ত তার পূর্ববর্তী সকল দার্শনিক মতবাদকে সন্দেহ করেন। অতপর নিজস্ব দর্শন গড়ে তোলেন। একথা ঠিক যে, সংশয় ও সন্দেহ না থাকলে নতুন কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব হয় না। আর এ কথাটি যে কেবল দর্শনের বেলায় প্রযোজ্য তা নয়, ধর্মের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ গৌতম বুদ্ধ তাঁর পূর্বের ধর্মসমূহে সন্দেহ পোষণ করাতেই প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন নতুন ধর্ম।

জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন থেকেও দর্শনঃ অনেকে মনে করেন, জীবনের মৌলিক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করাই কেবল দর্শন নয়, জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনসহ আরো অনেক প্রয়োজন থেকেও দার্শনিক আলোচনার উৎপত্তি ঘটে। প্রয়োগবাদী দার্শনিক মতবাদ ব্যবহারিক প্রয়োগকে প্রাধান্য দিয়েই যাত্রা শুরু করে। উইলিয়াম জেমস, জন ডিউই, এফ.সি শিলার প্রমুখ এ দর্শনের প্রধান প্রবক্তা। জন ডিউই তার শিক্ষাতত্ত্বে উল্লেখ করেন, যে শিক্ষা মানুষের কাজে লাগে না তা প্রকৃত শিক্ষা নয়। হাতে কলমে শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাকে তারা বেশি গুরুত্ব দেন। বিখ্যাত দার্শনিক কানিং হামও তাই মনে করেন। মানুষের প্রয়োজনই মানুষকে জগত সম্বন্ধে তাকে চিন্তা করতে বাধ্য করে। একইভাবে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে গড়ে উঠে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক মতবাদ। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জ্যাঁ পল সাত্র, কিয়াকেগার্ড প্রমুখ মনে করেন মানুষ এ সমস্যা বহুল পৃথিবীতে অসহায় অবস্থায় জন্ম নেয় এবং বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। হাজারো পরিস্থিতির মধ্যে তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় একান্ত নিজের জন্য। সেক্ষেত্রে তাকে তার নিজস্ব প্রয়োজন ও সমস্যার আলোকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তার কোন প্রয়োজনকেই সে উপেক্ষা, অবহেলা বা অস্বীকার করতে পারে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি মানুষের এ অস্তিত্বের উপরে গুরুত্বারোপ করে জীবনের লক্ষ্য ও মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করে থাকে, যা মানুষের সমস্যা বা প্রয়োজনকেই গুরুত্ব দিয়েই অস্তিবাদী দর্শন যাত্রা করে। এভাবে দেখা যায় জীবনের নানা প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধান কল্পেও দর্শনের উৎপত্তি হয়ে থাকে বলে মনে করা হয়। ভারতীয় চার্বাক দর্শনও মানুষের প্রয়োজনেই উদ্ভূত হয়।

মানুষের আধ্যাত্মিক পিপাসা থেকে দর্শনঃ মানুষ দৈহিক ও মানসিক উভয়টির সমন্বয়ে গঠিত। সে যুগে যুগে মানসিক তৃপ্তি ও শান্তির অন্বেষায় কাজ করে। আধ্যাত্মিক পিপাসা ও প্রয়োজন তারই একটি দিক যা মানুষের চিরন্তন সমস্যা। পরম সত্তার পরিচয় পাওয়া, অনাবিল শান্তি, বিষণ্ন-শান্তি ইত্যাদি মরমীয়বাদের জন্ম দেয়। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণেই দর্শনের উৎপত্তি। মহর্ষী কপিল (সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক) বলেন, এ জগতে মানুষ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপে তাপিত। এই অশান্তি থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা থেকেই দর্শনের উৎপত্তি।

দর্শনের পরিধি ও বিষয়বস্তু (Scope and Subject Matter of Philosophy)

আমরা ইতোপূর্বের আলোচনায় জেনেছি দর্শন একটি সর্বাত্মক বিষয়। জীবন ও জগতের মৌলিক সমস্যা বা প্রশ্নসহ মানুষের অভিজ্ঞতার সকল দিকই দর্শনের আওতাভুক্ত। ডক্টর স্কিয়াড এজন্যই বলেন, "মানব অভিজ্ঞতার এমন কোন দিক নেই, সমগ্র সত্তা রাজ্যের এমন কোন কিছু নেই, যা দর্শনের পরিধি বা আওতার বাইরে, কিংবা দার্শনিক অনুসন্ধান কর্ম যা দিকে প্রসারিত হয় না।" (কোন একটি বিষয়ের আলোচ্যসূচি (Content)-কেই বিষয়ের পরিধি ও বিষয়বস্তু বলা যেতে পারে যেহেতু দর্শন একটি সর্বাত্মক বিষয় তাই এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে দর্শনের বিষয়বস্তুকে পাঁচটি ভাগে আলোচনা করা হলো।

১. **অধিবিদ্যা (Meta Physics)ঃ** অধিবিদ্যা দর্শনের একটি অন্যতম শাখা। অধিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Meta Physics শব্দটি গ্রীক শব্দ Meta ও Phisics শব্দদ্বয় থেকে উদ্ভূত। Meta অর্থ 'পর' আর Phisics শব্দের বাংলা অর্থ পদার্থবিদ্যা। তাই ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে যা পদার্থ বিদ্যার পরে অবস্থিত তাই অধিবিদ্যা।

দর্শনের যে শাখাটি বস্তুর প্রাতিভাসিক রূপের অন্তরালে অবস্থিত প্রকৃতরূপ নিয়ে আলোচনা করে তাকেই বলে অধিবিদ্যা। বিশ্বজগতের প্রকৃত সত্তা সম্পর্কিত আলোচনাই এতে প্রাধান্য পায়। কিছু অধিবিদ্যা (Meta Physical) প্রশ্ন থেকে আমরা অধিবিদ্যার প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থ ধারণা নিতে পারি। যেমন, আত্মা কী, আত্মা নশ্বর না অবিনশ্বর? ঈশ্বর কী? ঈশ্বরের অস্তিত্ব কীভাবে প্রমাণ করা যায়? দেশ-কাল বলতে কী বুঝায়? দেহ ও মনের সম্পর্ক কী? আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বাইরে কোন জগত আছে কী? সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক কী? প্রকৃত জগত কোনটি? ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও উত্তর অনুসন্ধান করে দর্শনের অধিবিদ্যা নামক শাখাটি।

২. **জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology):** জ্ঞানতত্ত্ব বা জ্ঞানবিদ্যা দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র, যা জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞানের প্রকৃতি, চিন্তার সূত্র ও পদ্ধতি, সত্যতা ও এর মানদণ্ড, জ্ঞানের বিষয়বস্তু, জ্ঞানের সীমা, জ্ঞানের বৈধতা, জ্ঞান আহরণের উপায় ও পদ্ধতিসমূহ, যেমন– বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, স্বজ্ঞাবাদ, বিচারবাদ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে থাকে। সত্যতার ন্যায় বৈধতার প্রসঙ্গটিও একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্ন তাই জ্ঞানের বৈধতার প্রসঙ্গটিও জ্ঞানবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। জ্ঞানবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে– Epistemology। শব্দটি "Institutes of Meta Physics" নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন জে, এফ ফোরিয়ার। Epistemology শব্দটি গ্রীক শব্দ Episteme ও Logos শব্দ দুটি থেকে উদ্ভূত। Episteme-এর বাংলা অর্থ জ্ঞান (Knowledge) এবং Logos শব্দটির বাংলা অর্থ হলো বিদ্যা বা বিজ্ঞান। তাই ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে Epistemology শব্দটির বাংলা অর্থ দাঁড়াচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞান বা জ্ঞানবিদ্যা।

৩. **মূল্যবিদ্যা (Axiology of Philosophy of Values):** দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে মানবতার কল্যাণ সাধন করা। আর তাই দার্শনিকগণ জগত-জীবনের মূল ধারণ করতে গিয়ে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে মূল্য সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে চলেছেন। দর্শনের যে শাখাটি আদর্শ বা মূল্য আর্দশের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলা হয় মূল্যবিদ্যা। মূল্যবিদ্যাকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, যেমন– যুক্তিবিদ্যা (Logic), নীতিবিদ্যা (Ethics) ও নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics)। যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করে সত্যতার স্বরূপ নিয়ে, নীতিবিদ্যা আলোচনা করে মঙ্গলের স্বরূপ নিয়ে আর নন্দনতত্ত্ব আলোচনা করে সৌন্দর্যের স্বরূপ নিয়ে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মূল্যবিদ্যা দর্শনের একটি অন্যতম শাখা যেখানে মূল্য বা আদর্শ কী, মূল্যের স্বরূপ কেমন, মূল্য ব্যক্তিগত না বস্তুগত, মূল্য ও সত্তার সম্পর্ক কী, মূল্য সম্পর্কিত বচনের স্বরূপ তার তাৎপর্য নির্ধারণ করা এবং সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল প্রভৃতি পরম আদর্শগুলোর স্বরূপ উদঘাটন করাসহ ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ ও সৌন্দর্যগত মূল্যবোধের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় ও সমন্বয় সাধন করাও মূল্যবিদ্যার কাজ।

৪. **মনোদর্শন (Philosophy of Mind):** দর্শনের এই শাখাটিও সাম্প্রতিককালে দর্শন ইতিহাসের অন্যতম শাখায় পরিণত হছে। মনোদর্শন নামক এই শাখাটি মন বা আত্মার স্বরূপ, দেহ ও মনের সম্পর্ক, ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে।

৫. **বিশ্বতত্ত্ব (Cosmology):** ইংরেজি Cosmology শব্দটির বাংলা অর্থ বিশ্বতত্ত্ব। Cosmology শব্দটি গ্রীক শব্দ Kosmos থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ সুশৃংখল বিশ্বজগত (Ordered Universe)। বিশ্বজগতের যে পরিদৃশ্য মানরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি যেমন– জড়, প্রাণ, দেশকাল, বিবর্তন, পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় নিয়েই দর্শনের এই শাখায় আলোচনা করা হয়।

দর্শনের স্বরূপ (Nature of Philosophy)

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে আমরা দর্শন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছি। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এখন আমরা পৃথকভাবে দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করব। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, দর্শনের স্বরূপ জানতে হলে অবশ্যই দর্শনের আলোচ্য বিষয়, দর্শনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, দার্শনিক সমস্যাবলি ও এর

আলোচনার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়াদির ওপরেই তা বহুলাংশে নির্ভর করে। কাজেই দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে সেসব বিষয়ের উপর আমাদের গুরুত্ব দেয়া দরকার। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোক দর্শন
২. আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে দর্শন
৩. সমস্যাবলীর দিবালোকে দর্শন
৪. পদ্ধতিগত দিক থেকে দর্শন
৫. জীবন-দর্শনের আলোকে দর্শন।

১. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোক দর্শন:** দর্শনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সাথে এর স্বরূপের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। দর্শন জীবন ও জগতের মৌলিক প্রশ্নসমূহের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে এক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। খণ্ড খণ্ড আকারে জীবন-জগতে দেখা দর্শনের লক্ষ্য নয় বরং সার্বিকভাবে জীবন-জগতের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করাই দর্শনের লক্ষ্য। তাই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিক থেকে বলা যায় দর্শন একটি সর্বাত্মক বিষয়ের দিক নির্দেশনা দান করে থাকে। সেদিক থেকে আমরা বলতে পারি যে, জ্ঞানার্জনের যে বিষয় বা শাখাটি জীবন ও জগতের মৌলিক প্রশ্নাবলিকে সব সময় একটি যৌক্তিক পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণ করে তার প্রকৃত তাৎপর্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের সম্যক অবগত করে তাকেই বলা হয় দর্শন। এ কারণেই প্যাট্রিক বলেন, বস্তুর আদ্যোপান্ত চিন্তা-কলা কিংবা বস্তুর আদ্যোপান্ত চিন্তা প্রয়াসের অভ্যাসই হচ্ছে দর্শন। তবে দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ কেবলমাত্র তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আলোকে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

২. **আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে দর্শন:** দর্শনের স্বরূপ যেমন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আলোকে নির্ণয় করা যেতে পারে, তেমনি তার আলোচ্য বিষয়ের আলোকেও অনেকটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। মানব অভিজ্ঞতার তথা জ্ঞানের সকল শাখাই যেহেতু দর্শনের অন্তর্ভুক্ত তাই এর প্রকৃতি বা স্বরূপ সাধারণ ও সর্বাত্মক। বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে সচেতনভাবে বা অচেতনভাবেই হোক মানুষের মনে এমন কিছু প্রশ্ন জাগে যাদের কোন যুক্তি সঙ্গত উত্তর ধর্মতত্ত্বে যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি আবার বিজ্ঞান এদের নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না। যেমন– আমাদের কর্মের স্বাধীনতা আছে কি নেই, না-কি তা নিয়তি দ্বারা পূর্বনির্ধারিত যা দ্বারা আমরা প্রতিনিয়ত চালিত হচ্ছি, দেহের সাথে আত্মার সম্বন্ধ কী? এ জাতীয় প্রশ্নের কোন যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা ধর্মতত্ত্বের খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সবের উত্তর ধর্মতত্ত্ব ধর্মীয় দৃষ্টিতেই দিয়ে থাকে; কিন্তু কিছু বিজ্ঞান মনস্করা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাই তারা বিজ্ঞানের কাছে উত্তর অনুসন্ধান করেন। আর ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী এই যে অনধিকৃত একটি রাজ্য তাতেই দর্শন বিচরণ করে চলেছে। আর এ কারণেই রাসেল দর্শনকে বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যবর্তী অনধিকৃত রাজ্য (No Man's Land) বলে অভিহিত করেছেন।

৩. **সমস্যাবলির দিবালোকে দর্শন:** আমরা ইতিপূর্বের আলোচনায় জেনেছি যে, জগত-জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ও সর্বজনীন সমস্যাবলি নিয়ে দার্শনিকগণ কাজ করেন। প্রকৃতিগত দিক থেকে দার্শনিক সমস্যাবলি দৈনন্দিন ও সত্যানুগতিক সমস্যাবলি থেকে আলাদা। যেমন– কেউ যদি মনে করেন আমার ব্যবসায় লাভ হচ্ছে না কেন অথবা আজকের দুপুরে রান্না কী হলে ভাল হয়, কিংবা আজ বেড়াতে যাব কি যাব না ইত্যাদি সমস্যা হচ্ছে দৈনন্দিন ও ব্যক্তিগত প্রশ্ন এ জাতীয় প্রশ্ন দার্শনিক আলোচনার বিষয় নয়। তবে আমি কে এই জগত কেন সৃষ্টি হল, স্রষ্টা বলে কেউ আছেন কী না, আত্মা কী, আত্মা অমর নাকি নশ্বর, জ্ঞান কীভাবে কোন পথে আর্জিত হয়, মানুষের জীবন মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়, নাকি পুররুত্থান বা পুন:জ্জীবন বলে কিছু আছে, নৈতিকতা কী, সদগুণ ও সততা আসলে কী, তা বংশগত না ব্যক্তিগত ইত্যাদি জীবন সমস্যার অনুসন্ধান করাই দার্শনিকের কাজ। কাজে দেখা যাচ্ছে যে, দর্শনের কাজ হলো জীবন ও জগতের মৌলিক, সর্বজনীন, অনুপম ও অনন্য প্রশ্নসমূহের একটি যৌক্তিক সমাধান করা। আর সেদিক থেকে বিবেচনা করলে নি:সন্দেহে দর্শন একটি মৌলিক বিষয়।

৪. **পদ্ধতিগত দিক থেকে দর্শনঃ** দর্শন যেহেতু জগত-জীবনের মৌলিক প্রশ্নের যৌক্তিক অনুসন্ধান, তাই দর্শন একদিকে যেমন বিচার বিশ্লেষণধর্মী, (Reflective) অন্যদিকে আবার গঠনমূলক (Constructive) বটে। যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণই হচ্ছে দর্শনের যথার্থ পদ্ধতি। তাই পদ্ধতিগত দিক থেকে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট পার্থক্য। বিজ্ঞানে যেখানে পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষণ জাতীয় বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, দর্শনে সেখানে বিজ্ঞানমূলক পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়ে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পায়। কেননা যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণই (Argument and Analysis) হচ্ছে দর্শনের যথার্থ পদ্ধতি। তাই পদ্ধতিগত দিক থেকে দর্শন বিজ্ঞান থেকে একেবারেই আলাদা। মোটকথা পদ্ধতিগত দিক থেকে দর্শনের স্বরূপ হলো এটি সব সময় বিচারধর্মী ও গঠনমূলক (Constructive)।

৫. **জীবন-দর্শন হিসেবে দর্শনঃ** জীবন কেবল সত্তার স্বরূপ ও অর্থই ব্যাখ্যা করে তা নয়, আবার জগত-জীবনের মৌলিক প্রশ্নের যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে বা দার্শনিক সমস্যাবলির পদ্ধতিগত আলোচনা মাত্র তাও বলা যায় না। অনেকেই মনে করেন দর্শন মানেই জীবন দর্শন। দর্শন বলতে যা বুঝায় তা অবশ্যই জীবন ঘনিষ্ট হতে হবে। জীবনের সাথে যা সম্পৃক্ত নয়, বা জীবনের কোন কাজে লাগেনা তেমন বিষয় দর্শন হতে পারে না। এদেশেরই স্বনাম ধন্য দার্শনিক ড. জি. সি দেব "আমার জীবন দর্শন"– গ্রন্থে দর্শনকে 'জীবন দর্শন' হিসিবে চিহ্নিত করেন। অবশ্য তিনি তত্ত্বজ্ঞানকে জীবনের প্রয়োজন থেকে আলাদা করে দেখেননি। সাধারণ মানুষের কাজে দর্শনকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রয়াসেই তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। দর্শনকে সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। তিনি মনে করতেন মানুষের জীবনের দুটো দিক রয়েছে, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক। এদের মধ্যে কোন একটিকে বাদ দিয়ে জীবন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, বরং দুটোর সমন্বয়েই গড়ে উঠে সার্থক জীবন। কাজেই দর্শনকে কেবল তত্ত্বালোচনার বিষয় বলে যারা ভুল বুঝেন তাদের সে ধারণা পরিবর্তন করা আবশ্যক। কেননা দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ এমন যে তা কখনোই কোথাও থেমে থাকার বিষয় নয় এবং এটা গতিশীল ও বিচার বিশ্লেষণধর্মী জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয় যাতে জীবনে ও জগতের যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে। আর এজন্য বোধ হয় মহান দার্শনিক এ্যারিস্টটল বলেছিলেন, "আইনের ভয়ে অন্যেরা যা করে থাকে, স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তা করার প্রেরণা ও ক্ষমতা আমি দর্শন থেকে পেয়েছি"।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইংরেজি Philosophy শব্দটি বাংলা প্রতিশব্দ 'দর্শন' করা হয়েছে কেন?
   ক. উভয়ের আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য একইরূপ
   খ. উভয় শব্দই একই শব্দ থেকে উদ্ভুত
   গ. উভয় শব্দই সম-অর্থে ব্যবহৃত হয় বলে
   ঘ. সবগুলোই

২. দর্শন জীবন জগতের কোন ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে?
   ক. সাধারণ প্রশ্ন
   খ. ব্যতিক্রমধর্মী প্রশ্ন
   গ. মৌলিক সমস্যা সংক্রান্ত
   ঘ. যৌক্তিক সমস্যা নিয়ে

৩. সকল গবেষককে ডক্টর অব ফিলোসফি (Ph.D) বা দর্শন পণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত করা হয় কেন?
   ক. দর্শনের ব্যাপকতার কারণে
   খ. জ্ঞানের সকল শাখাই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত বলে
   গ. দর্শন সত্যানুসন্ধানী বলে
   ঘ. দার্শনিক মাত্রই জ্ঞান অনুরাগী

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. দর্শন কী? দর্শনের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. দর্শন ও দার্শনিক বলতে কী বুঝায়? দর্শনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দর্শন কী? দর্শনের পরিধি নির্ণয় করুন।
২. দর্শন কোন সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করে।
৩. দর্শনের উৎপত্তির প্রধান দু'টি কারণ ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ১.২: দর্শন ও অন্যান্য বিষয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- দর্শন ও ধর্মের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- দর্শন ও মূল্যবিদ্যার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যা কী বলতে পারবেন।
- দর্শন ও ইতিহাসের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।

কোন বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জ্ঞানার্জনের অন্যান্য বিষয়ের সাথে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তার সম্বন্ধ নির্ণয় করা। তাছাড়া তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সবলতা, দুর্বলতা, উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা খুব সহজেই আমাদের নজরে আসে। তাই দর্শনের স্বরূপকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করার জন্য অন্যান্য বিষয়ের সাথে দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন।

দর্শন এমন একটি বিষয় যা জীবন জগতের সকল বিষয় তথা মৌলিক প্রশ্নসমূহের বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। তাই জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যা দর্শনের আওতার বাহিরে। দর্শন জ্ঞানের সকল শাখা, যেমন– পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, সৌন্দর্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি। এ সকল অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সামগ্রিক সত্তার স্বরূপ নির্ণয় করে থাকে তাই নয়, জগত ও জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করাসহ পরম আদর্শের আলোকে জীবন ও জগতের মূল্য ধারণের প্রয়াস পায়। অর্থাৎ জগত জীবনের মৌলিক সমস্যাবলির একটি সুষ্ঠু, যুক্তিসম্মত ও গুঢ় আলোচনার প্রচেষ্টা চালায় দর্শন। কাজেই যে বিষয়গুলোর সাথে দর্শনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সেগুলো নিয়ে এই পাঠটিতে ৭টি পর্যায়ে আলোচনা করব।

দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক

দর্শন কী তা ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি কাজেই সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করে বিজ্ঞান বলতে কোন বিষয়কে বুঝায় সেটা জেনে নেই। 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ 'বিশেষ জ্ঞান'। জ্ঞানের কোন একটি শাখায় বা বিভাগের সুনিয়ন্ত্রিত, সুশৃঙ্খল ও সুসংহত জ্ঞান যা কিনা নিরপেক্ষ পর্যালোচনার মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদের সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরে। তাই সাধারণ জ্ঞান থেকে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা। বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যই হলো প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের জন্য ক্রমাগত প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া। বিজ্ঞান মাত্রই প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে আলোচনা করে থাকে। সে দিক থেকে বিজ্ঞানকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন–

১. জড় বিজ্ঞান, ২. জীববিজ্ঞান, ৩. মনোবিজ্ঞান, ৪. সামাজিক বিজ্ঞান এবং ৫. প্রযুক্তিবিদ্যা বা যন্ত্র বিজ্ঞান।

তবে বর্তমান বিশ্বে আরো একটি বিজ্ঞানের চর্চা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে তার নাম হলো অপরাধ বিজ্ঞান (Criminology)। প্রত্যেকটি বিজ্ঞান তত্ত্ব বিশ্লেষণের সাথে সাথে মানব জীবনের ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়াস চালায়।

"বিজ্ঞান" শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ "Science" যা ল্যাটিন শব্দ "Scientia"শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হলো জ্ঞান। তাই উৎপত্তিগত দিন থেকে বিজ্ঞান বলতে বুঝায় বিশেষ কোন জ্ঞানকে। এটা বিশেষ অর্থে বিজ্ঞান, কিন্তু

ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞান হচ্ছে তাই যা অজ্ঞানের অতীত। যদিও জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও উন্নয়নের ধারাবাহিক ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, অতি প্রাচীনকালে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা হত না। যেমন– গ্রীক দার্শনিক থেলিস (৫২৪-৫৪৬ খ্রী.) এর সময় থেকে প্লেটো, এরিস্টটল পর্যন্ত দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপক উৎকর্ষ ঘটে। মধ্যযুগে প্রাচ্যের দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ইবনেসিনা, ইবনে খালদুন, আলফারাযী, আল গাযালী প্রমুখ দার্শনিক ও বিজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনের উৎকর্ষ সাধন করেন। এভাবেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের হাত ধরে আধুনিক বিজ্ঞান অগ্রসর হতে থাকে কোপারনিকাস, ভারউইন প্রমুখের মাধ্যমে। দর্শন ও বিজ্ঞানের যাত্রা অভিন্নভাবে শুরু হলেও এ দু'য়ের মাঝে যেমন রয়েছে সাদৃশ্য তেমনি রয়েছে যথেষ্ট বৈশাদৃশ্যও। প্রথমে আমরা জেনে নেই এ দুয়ের সাদৃশ্যগুলো কী কী।

বিজ্ঞান ও দর্শনের সাদৃশ্য (Similarities Between Philosophy and Science)

দর্শন ও বিজ্ঞানের সাদৃশ্যগুলো নিম্নরূপ:

১. দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়েরই লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন। কেননা উভয়ই সত্যানুসন্ধান ও জ্ঞান আহরণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। উভয়েই জীবন ও জগতের রহস্য উদঘাটন করতে চায়।

২. দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়েই প্রকৃত রহস্য উদঘাটন তথা অজানাকে এবং সত্যানুসন্ধানে অবিরাম তাই নয়, অনেক জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজ, সাবলীল ও সুসংবদ্ধকারে তুলে ধরে এবং ফলে নতুন জ্ঞান আহরণ ও উন্মোচন সম্ভব হয়।

৩. বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দার্শনিক জ্ঞান উভয়েই বিশ্ব জগত সম্পর্কে ঐক্যের ধারণা জাগ্রত করে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে ঐক্যের ধারণা প্রদান করে থাকে আর দর্শন সেগুলোকে একটা পূর্ণ ঐক্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্ব জগতকে ব্যাখ্যা করে। মোটকথা বিজ্ঞান প্রদত্ত আংশিক ঐক্যই দর্শনের কল্যাণে পূর্ণাঙ্গ ঐক্যের ধারণা জাগাতে প্রয়াস চালায়।

৪. দর্শন ও বিজ্ঞান দুইই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মাধ্যমেই প্রথমে যাত্রা শুরু করে এবং উভয়েই চিন্তার মৌলিক সূত্রগুলো মেনে নিয়ে তাদের অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করে, যেমন– কার্যকারণতত্ত্ব।

৫. দর্শন ও বিজ্ঞান জগত ও জীবনের ঘটনাবলির ব্যাখ্যা দাতা হিসেবে একই পথের যাত্রী। এ কারণেই প্যাট্রিক বলেন, "দর্শন ও বিজ্ঞানের একই প্রকৃতি এবং একই উদ্দেশ্য সত্যের জন্য শুভ এবং শ্রমসাধ্য অনুসন্ধান।" প্রকৃত পক্ষে দর্শন ও বিজ্ঞানের সাথে উল্লেখযোগ্য কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। উভয়ে উভয়ের পরিপূরক ও ঘনিষ্ট সহায়করূপে কাজ করে। দার্শনিক কানিংহাম এ কারণেই মন্তব্য করেছেন, "সাধারণ জ্ঞানের রাজ্য থেকে বিজ্ঞানের জ্ঞানের রাজ্যে আসতে যেমন আমরা কোন নতুন রাজ্যে প্রবেশ করি না, আবার বিজ্ঞানের রাজ্য থেকে দর্শনের রাজ্যে আসতেও তেমনি আমরা অভিজ্ঞতার জগতকে অতিক্রম করি না।

দর্শন ও বিজ্ঞানের বৈসাদৃশ্য

দর্শন ও বিজ্ঞানের মাঝে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মাঝে আলোচনার পদ্ধতি ও পরিণতির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। এ কারণেই এ.সি. উইং বলেন– আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে দর্শন ও বিজ্ঞান একই পথের যাত্রী হলেও যাত্রার বাহনে, অর্থাৎ পদ্ধতি ও পরিণতির দিক থেকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়ে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। নীচে পার্থক্যগুলো উল্লেখ করা হলো–

১. মানব অভিজ্ঞতার সকল দিক নিয়ে দর্শন আলোচনা করে অর্থাৎ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি সার্বিক বা অখণ্ড। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত বা বিশেষ। কারণ প্রতিটি বিজ্ঞান একটি বিশেষ বিভাগ নিয়ে আলোচনা করে।

যেমন– পদার্থ বিজ্ঞান শুধু পদার্থের প্রকৃতি নিয়েই আলোচনা করে। জীব বিজ্ঞান কেবল জীব নিয়েই আলোচনা করে। দর্শন সমগ্র বিশ্ব জগত নিয়ে আলোচনা করে।

২. দর্শন যুক্তির কষ্টি পাথরে সব কিছুকে যাচাই করে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে। কিন্তু বিজ্ঞান বিনা বিচারে কতকগুলো স্বত:সিদ্ধ নীতিমালাকে স্বীকার করে নিয়ে বিষয় বস্তুর ব্যাখ্যা প্রদান করে। পক্ষান্তরে, দর্শন নির্বিচারে কোন কিছুই স্বীকার করে না।

৩. দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে পদ্ধতিগত দিক থেকেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। দর্শনের পদ্ধতি হলো বিচার বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা দান। আর বিজ্ঞানের পদ্ধতি হলো অভিজ্ঞতা ভিত্তিক। যেমন– পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও আরোহ পদ্ধতি (বিশেষ থেকে সার্বিকে গমন)।

৪. দর্শন বস্তুর প্রাতিভাসিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় সত্তা নিয়েই আলোচনা করে। বস্তুর প্রাতিভাসিক রূপের অন্তরালে কোন পরমসত্তা আছে কিনা সেটা নিয়েও দর্শন আলোচনা ও অনুসন্ধান করে। কিন্তু বিজ্ঞান শুধু বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করে এর অন্তরালে পরম সত্তার সন্ধান সে করে না।

৫. বিজ্ঞানের কাজ আবিষ্কার করা, দর্শনের কাজ মূল্যের মূল্যধারণ করা। বস্তুর পরিমাণগত ও গুণগত উভয় দিকই দর্শন আলোচনা করে। কিন্তু বিজ্ঞান শুধু পরিমাণগত দিক নিয়ে আলোচনাতেই থাকে। তাই দর্শনের পরিধি বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক।

৬. দর্শনের পদ্ধতি ব্যাপক হওয়াতে একই বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে যথেষ্ট বাক্যচিরন্ত ও মতবিরোধ দেখা যায় এবং ফলে দর্শন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত সর্বজনীন ও সুনিশ্চিত হয় না। কিন্তু বিজ্ঞান বিশেষ একটি বিভাগ নিয় কাজ করে বলে তার সিদ্ধান্ত অনেক বেশি সুনিশ্চিত ও সর্বজনীন হয়।

৭. বিজ্ঞান বস্তুর যে ব্যাখ্যা দেয় তা সবসময় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও যাচাই করে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু দার্শনিক আলোচনার বিষয়কে সেভাবে প্রমাণ করা যায় না।

৮. বিজ্ঞান ও দর্শনের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো– দর্শন জীবনকে এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করে থাকে। জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলোর কোন দিকই তাতে বাদ পড়ে না। কিন্তু বিজ্ঞান সেখানে জীবনকে ব্যাখ্যা দেয় গাণিতিক সূত্রের আলোকে। তাই মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে অক্ষম। কিন্তু দর্শন সেখানে সফল ও পূর্ণ।

৯. দর্শন আলোচনা করে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের যা মানুষকে সন্তুষ্টি এনে দেয়। তাই দর্শন মানেই বলা হয় জীবন দর্শন। কিন্তু বিজ্ঞান সেদিক থেকে মানুষকে তৃপ্ত করতে পারে না। এটা তার আলোচ্য বিষয়ও নয়।

১০. বিজ্ঞান যেমন এটম বোমা আবিষ্কার করে কিন্তু তার ফল বা পরিণাম নিয়ে মূল্যায়ন করে না যে এটা মানব জীবনে আর্শিবাদ নাকি অভিশাপ ও ভয়বহতা বয়ে আনবে? পক্ষান্তরে, দর্শন তা ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করে।

দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যা

জ্ঞানবিদ্যার সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক জানতে হলে আমাদের প্রথমেই দর্শনের স্বরূপ ও জ্ঞানবিদ্যার স্বরূপ আলোচনা করা দরকার। উল্লেখ্য দর্শনের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি। জ্ঞানবিদ্যা বলতে কী বুঝায় তা জেনে নেই।

জ্ঞানবিদ্যায় সাধারণত জ্ঞানের উৎপত্তি, স্বরূপ, বিষয়বস্তু, বৈধতা, সীমা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। কান্ট জ্ঞানবিদ্যাকে দর্শনের আদিপর্ব বলে মনে করেন। তাঁর মতে, জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা না করে দর্শনের অন্যান্য পর্ব, অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্যা ও মূল্যবিদ্যার আলোচনা করা ঠিক নয়। কান্ট ও ফিক্টে (১৭৬২-১৮১৪) দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জ্ঞানবিদ্যার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তাই কান্টের মতে, "দর্শন জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও সমালোচনা"। ফিকটের মতে, "দর্শন জ্ঞানের বিজ্ঞান বা জ্ঞান-বিজ্ঞান"। সাম্প্রতিককালে জ্ঞানবিদ্যা-সম্পর্কীয় আলোচনা দর্শনে একটা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে বেশ বুঝা যায় যে, কোন কোন দার্শনিক দার্শনিক সমস্যাবলি বা তত্ত্বালোচনার জন্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যাকে অভিন্ন বলে মনে করেন। আবার, কোন কোন দার্শনিক দার্শনিক সমস্যাবলি বা তত্ত্বালোচনার জন্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন না। উভয় মতই মনে হয় উগ্র ও একমুখী, কেননা দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যা অভিন্নও নয়।

দর্শনের সমস্যাবলি বা তত্ত্বালোচনার জন্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা থেকে একথা বেশ বুঝা যায় যে, আমরা যে দর্শনের সমস্যা বা তত্ত্বালোচনা করতে যাই, তা আলোচনা করার ক্ষমতা বা বৈধতা আমাদের আছে কিনা। তাই দার্শনিকের প্রথম কাজই হচ্ছে জ্ঞানের সীমা বা পরিধি বা যথার্থতা কতটুকু, তা নির্ণয় করে দেখা ও সে হিসেবে দার্শনিক সমস্যাবলির আলোচনার পথ নির্ধারণ করা। এদিক থেকে বলা যায়, জ্ঞানবিদ্যা হলো দর্শনের আদিপর্ব, যার উপর ভিত্তি করে সুষ্ঠু দার্শনিক আলোচনা গড়ে উঠে। তাই দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

দর্শন ও মূল্যবিদ্যা

মূলবিদ্যা বা আদর্শবিদ্যা মূল্য সম্পর্কীয় বচন, মূল্যের প্রকৃতি, তাৎপর্য, মূল্যের পরম আদর্শ বা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে মানব জীবনের চরম আদর্শ নিরূপণ ও সেই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে জগত ও জীবনের মূল্যাবধারণ করার প্রচেষ্টা চালায়। আদর্শবিদ্যাকে, অর্থাৎ বিশেষ করে নীতিবিদ্যাকে, দর্শনের শেষ পর্ব বলা হয়। অনেকে দর্শনের এই শেষ পর্বকে ব্যাপক অর্থে জীবন দর্শন বলেও আখ্যায়িত করেন। কেননা মানুষ পরম আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে জগত ও জীবনের মূল্য নিরূপণ, অর্থাৎ জগত ও জীবনের মূল্যায়নের মাধ্যমেই তার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকেরা বলেন যে, অতীন্দ্রিয় সত্তা অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু নয়। সে হিসেবে অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। তাই তাঁদের মতে, সত্তালোচনা বা সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার বা চরম আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে জগত ও জীবনের মূল্যায়ন করা নিরর্থক মাত্র। মূল্য সম্পর্কীয় বচনগুলো আবেগপূর্ণ বচন ছাড়া আর কিছুই নয়। চরম সন্দেহবাদী দার্শনিকেরাও অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে চান না হিসেবে সত্তালোচনা এবং জগত ও জীবনের মূল্যায়নের প্রশ্নাবলিকে নিরর্থক বলে মনে করেন। কিন্তু আদর্শবিদ্যাকে দর্শনের একটি শাখা হিসেবে মেনে নিলে বলতে হয় যে, দর্শনের সাথে মূল্যবিদ্যার সম্পর্ক খুবই নিবিড়।

দর্শন ও ধর্ম

দর্শন ও ধর্মের সম্পর্ক আপাতদৃষ্টিতে বিরোধপূর্ণ বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে এদের সম্পর্ক বেশ নিবিড়।

ধর্ম, 'ধৃ' ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার সোজা অর্থ হলো ধারণ করা। সাধারণ মানুষ ধর্মকে ধারণ করে, বা ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈশ্বরের প্রতি নিজের আনুগত্য প্রকাশ করে ইহজগত ও পরজগতে শান্তি ভোগ করার আশা পোষণ করে। বিভিন্ন চিন্তাবিদ ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

ধর্ম উচ্চতর মূল্যের গভীর ও সহজ প্রকৃতিমূলক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ তার নিজের আত্মার পূর্ণতা লাভের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে চেনার প্রচেষ্টা চালায়। তাই সূফীবাদে বলা হয় যে, যে ব্যক্তি আত্মাকে চিনেছে, সে ব্যক্তি তার প্রভুকে চিনেছে। ধর্ম হলো এমন একটি ভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি, যা বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি এবং যে বিশ্বাসের ফলে মানুষ মনে করে যে, এ জগত যান্ত্রিক নয়, বরং এ জগতের সৃষ্টির পিছনে একজন সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর রয়েছেন, যিনি ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্যের বিচার করেন। পরম বা শাশ্বত মূল্যকে মানুষের মন মোটামুটিভাবে জানতে চায়।

মানুষ এই পরম শক্তি বা অদৃষ্ট শক্তির সংস্পর্শে এসেই ইহজগত ও পরজগতে শান্তি পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এল. পি জ্যাকস বলেন, "ধর্মের জীবনী শক্তিই হলো অতি উৎকৃষ্টের প্রতি অনমনীয়ভাবে আনুগত্য"।

দর্শন ও ধর্মের সাদৃশ্যঃ দর্শন ও ধর্মের প্রধান সাদৃশ্য এই যে, উভয়ের লক্ষ্য জগত ও জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করে সত্যানুসন্ধান করা। দর্শন ও ধর্ম উভয়ই একই ধরনের কতকগুলো সমস্যা, যেমন জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মা, আত্মার অমরত্ব, পরমতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। উভয়ই বিশ্বজগতের স্বরূপ ব্যাখ্যা বা প্রকৃতির রহস্যকে জানার প্রচেষ্টা চালায় এবং উভয়ই এই বিশ্বজগতে মানুষের স্থান, কাজ ও ভাগ্যের বিষয় নিয়েও আলোচনা করে।

দর্শন ও ধর্মের বৈসাদৃশ্যঃ দর্শন ও ধর্মের মধ্যে যদিও কতকগুলো সাদৃশ্য রয়েছে, তথাপি এদের মধ্যে কতকগুলো বৈসাদৃশ্যও রয়েছে।

১. দর্শনের কাজ হলো প্রধানত বুদ্ধিভিত্তিক বা বিচারভিত্তিক। পক্ষান্তরে, ধর্মের কাজ হলো বিশ্বাসভিত্তিক বা ব্যবহারিক। দর্শনের ক্ষেত্রে জগতের রহস্যকে জানার ব্যাপারে বিচার-বিবেচনার পথকে অনেকাংশে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, ধর্মের ক্ষেত্রে অন্ধ বিশ্বাস বা সরল বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে মিলনের জন্য মানুষ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক আচরণের সাহায্য নিয়ে থাকে।
২. দর্শনের মূল্য উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান বা সত্যের প্রতি অনুরাগ। পক্ষান্তরে, ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো শান্তি, সংহতি, মুক্তি ইত্যাদির প্রতি অনুরাগ। তাই ধর্মের ক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনার পরিবর্তে উপলব্ধি বা হৃদয়ের প্রয়োগই হয় বেশি।
৩. দর্শনে কোন আচার-অনুষ্ঠান নেই। পক্ষান্তরে, ধর্মে আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে এবং ধর্মকে এগুলো মেনে চলতে হয়।
৪. দর্শন বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাগতিক সত্তার স্বরূপ নিরূপণ করার প্রচেষ্টা চালায়। পক্ষান্তরে, ধর্ম অন্তর দিয়ে আধ্যাত্মিক সত্তার স্বরূপকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা চালায়।

দর্শন ও ধর্মের মধ্যে কতকগুলো বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ই উভয়ের পরস্পর বিরোধী না হয়ে পরস্পরের পরিপূরক মাত্র। উভয়েরই কাজ মানুষের কৌতূহলকে দূরীভূত করার জন্য বিশ্বজগতের রহস্য উদ্ঘাটন করা। এই রহস্যকে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে বা সত্যকে জানতে গিয়ে দর্শন ধর্মের ভিত্তি, অর্থাৎ সরল বিশ্বাসকে নষ্ট না করে অনেক সময় ধর্মের ভিত্তিকে মূল্যায়নের মাধ্যমে আরও মজবুত করে তোলে।

তাই দর্শন যদি নির্বিচারভাবে জড়বাদী না হয়, বা ধর্ম যদি গোঁড়ামিভিত্তিক না হয়, তাহলে উভয়ে উভয়ের সাহায্যে এই বিশ্বজগতে মানুষকে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে বা বিচার-বুদ্ধির বেশি উগ্রতা থেকে মুক্ত করে সুন্দর, সুখী ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

দর্শন ও ইতিহাস

দর্শন বলতে আমরা মোটামুটিভাবে মানুষের প্রকৃতি এবং যে জগতে মানুষ বসবা করে, তার সাথে জড়িত মৌলিক সমস্যাবলির যুক্তিসঙ্গত তত্ত্বানুসন্ধানকে বুঝে থাকি। ইতিহাস বলতে আমরা মোটামুটিভাবে অতীত ঘটনার সংরক্ষিত রূপ বা পূর্ব বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় তথ্য বা জ্ঞানকে বুঝে থাকি। দর্শন ও ইতিহাসের স্বরূপ থেকে এটা বেশ বুঝা যায় যে, দর্শন বিশেষ করে তত্ত্বজিজ্ঞাসা এবং ইতিহাস তথ্য দিয়ে আলোচনা করে।

দর্শন ও ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলা যায় যে, দর্শন ও ইতিহাস পরস্পরের পরিপূরক। দর্শন ইতিহাসের দেয়া তথ্যগুলি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করে। পক্ষান্তরে, দর্শনের তত্ত্বকথার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝার ক্ষেত্রে ইতিহাসের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সঠিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দার্শনিক চিন্তা, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। আবার, দর্শনের তত্ত্বকথার প্রকৃত তাৎপর্য তখনই বুঝা সহজতর হয়ে

উঠে যখন তা ইতিহাসের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়। ইতিহাসের আলোকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন যুগের দার্শনিক আলোচনার ইতিহাসকে বলা হয় দর্শনের ইতিহাস। কিন্তু দর্শনের আলোকে ইতিহাসের যখন ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করা হয়, অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবরণ বা ঘটনার মৌলিক প্রশ্ন বা তত্ত্ব নিয়ে যখন আলোচনা করা হয়, তখন ইতিহাসেক ইতিহাসের দর্শন বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃত সত্য–
   ক. আবিষ্কার করা
   খ. উদ্ভাবন করা
   গ. ব্যাখ্যা করা
   ঘ. নির্ণয় করা

২. দর্শন জ্ঞানের কয়টি শাখা আলোচনা করে?
   ক. পাঁচটি শাখা
   খ. তিনটি শাখা
   গ. দুইটি শাখা
   ঘ. সকল শাখা

৩. সৌন্দর্য বিজ্ঞান দর্শনের–
   ক. অংশ
   খ. কিছুই নয়
   গ. একটি শাখা
   ঘ. মূল শাখা

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ঘ, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. দর্শন বলতে কী বুঝায়?
২. মূল্যবিদ্যা কী?
৩. জ্ঞানবিদ্যার কাজ কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দর্শন ও বিজ্ঞানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরুন।
২. দর্শন ও ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় করুন।
৩. দর্শন ও মূল্যবিদ্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা বর্ণনা করুন।
৪. দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে পর্যালোচনা করুন।
৫. দর্শন ও ইতিহাসের সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

পাঠ- ১.৩: দর্শন আলোচনার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দর্শন আলোচনার পদ্ধতিগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- নির্বিচারবাদী পদ্ধতি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সংশয়বাদী পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- বিচারবাদী পদ্ধতি কী তা বলতে ও বর্ণনা করতে পারবেন।
- দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি কী তা বলতে পারবেন।
- স্বজ্ঞাবাদ ও বিশ্লেষণী পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

দর্শন

যে কোন বিষয়ে সুশৃঙ্খল আলোচনার জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি। দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কতকগুলো বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করেই দার্শনিকগণ জগত জীবন সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। দর্শনের ইতিহাস পাঠ থেকে আমরা যে কয়টি প্রধান পদ্ধতির উল্লেখ করতে পারি সেগুলো হলো–

১. নির্বিচারবাদী পদ্ধতি
২. বিচারবাদী পদ্ধতি
৩. সংশয়বাদী পদ্ধতি
৪. দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিগুলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসুন নিম্নে পদ্ধতিগুলোর স্বরূপ জেনে নেই।

নির্বিচারবাদ (Dogmatism)

জ্ঞানের উৎপত্তি, শর্ত, সীমা ও বৈধতা সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন না তুলে বরং পূর্ববর্তী কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে নির্বিচারে দার্শনিক সমস্যাবলির সমাধানের প্রয়াস পায় তবে তাকে বলা হয় নির্বিচারবাদ। দার্শনিক পদ্ধতি হিসেবে এই পদ্ধতিটি অতি প্রাচীন। কেননা দর্শনের ইতিহাস পাঠ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীনকালের দার্শনিকগণ এই পদ্ধতিকে তত্ত্বালোচনায় অনুসরণ ও প্রয়োগ করেছেন। যেমন– গ্রীক দার্শনিকগণের প্রাচীন মতবাদগুলো বিশেষ করে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা ও ব্যাখ্যায় নির্বিচারবাদী পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। এ পদ্ধতির মূলে যে তিনটি বিষয় কাজ করে তাহলো– অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও পূর্ব পরিকল্পিত ধারণা।

তবে নির্বিচারবাদ যে কেবল প্রাচীন কালের দার্শনিকগণই প্রয়োগ করেছেন তা নয়, মধ্যযুগ এমন কি আধুনিককালের দার্শনিকদের মধ্যেও পদ্ধতিটির প্রয়োগ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আধুনিককালের অনেক বুদ্ধিবাদী, অভিজ্ঞতাবাদী ও স্বজ্ঞানবাদী দার্শনিকগণ একটি অন্যতম প্রধান দার্শনিক পদ্ধতিরূপে নির্বিচারবাদী পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছেন। দেকার্ত, সিপনোজা, লাইবনিজ প্রমুখ বুদ্ধিকে এবং বেকন, লক, বার্চালি প্রমুখ অভিজ্ঞতাকে স্বত:প্রমাণিত ধারণা বা নীতি হিসেবে কোন প্রকার বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে সর্বপ্রথম দর্শনকে নির্বিচারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত করে বিচার বিশ্লেষণী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যার

ফলশ্রুতিতে তার প্রতিষ্ঠিত মতবাদ বিখ্যাত বিচারবাদ নামে প্রতিষ্ঠা পায়। এরপরই যে দার্শনিক সম্প্রদায় একে সমর্থন দিয়ে আরো জোড়ালোভাবে নির্বিচারবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তুলেন তারা হচ্ছেন যৌক্তিক দৃষ্টবাদীগণ। তাঁরা মূলত: দর্শনতত্ত্ব আলোচনার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি ছিলেন।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নির্বিচারবাদ পদ্ধতিকে বিবেচনায় নিলে এটাকে যথার্থ কোন দার্শনিক পদ্ধতি বলা যায় না। কেননা দর্শনের কাজ সত্য অনুসন্ধান ও অর্জন করা, যা বিচার বিযুক্ত কোন পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। তাছাড়া অন্ধ বিশ্বাস বা স্বত:সিদ্ধ কোন ধারণা অনুমান ও বিশ্বাসের আলোকে প্রভাবিত হয়ে প্রকৃত সত্য বা জ্ঞান লাভ করা কখনোই সম্ভব নয়। বরং তাতে দর্শনের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে। সে ক্ষেত্রে বিচার বিশ্লেষণী পদ্ধতিকেই অধিক যৌক্তিক ও বিজ্ঞান সম্মতি বলে অনুসরণ করা যেতে পারে। তবেই জ্ঞানের বৈধতা ও সীমার সঠিক সমাধান পাওয়া সম্ভব।

সংশয়বাদী পদ্ধতি (Scepticism)

আমরা জানি সন্দেহ বা সংশয় থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্ট সম্প্রদায় থেকে শুরু করে আধুনিক কালের দার্শনিক রেখে দেকার্ত, অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক এবং ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম সংশয়বাদের প্রবক্তা। তারা সবাই জ্ঞানের অনিবার্যতা, সম্ভাব্যতা ও নিশ্চয়তায় সংশয় প্রকাশ করেছেন তাই নয় এ সংশয়বাদী পদ্ধতিতেই দার্শনিক আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন।

এ পদ্ধতির প্রবক্তরা মনে করেন যে, যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় এবং যে কোন ধরনের জ্ঞানকেই সন্দেহ করা যেতে পারে। কেন না দার্শনিক কিংবা বিজ্ঞানী যে জ্ঞান প্রদান করুক তা নিশ্চিত বা চূড়ান্ত এটা বলা যাবে না। তারা মনে করেন, মানুষের অর্জিত সকল জ্ঞানই আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল, সর্বজনীন নয়। আর সে কারণে সংশয়বাদীরা ইন্দ্রিয় জগতের জ্ঞান ও অতীন্দ্রিয় জগতের জ্ঞান উভয়টি সম্পর্কেই সন্দেহ ও সংশয় পোষণ করেন।

সংশয়বাদের মূলকথা হলো কোন ধরনের বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই জ্ঞানের অসারতা প্রতিপাদন করা। এক্ষেত্রে নির্বিচারবাদের সাথে সংশয়বাদের পার্থক্য হলো নির্বিচারবাদ কোন বিচার বিশ্লেষণ যাচাই-বাছাই ছাড়াই জ্ঞানের সম্ভাব্যতাকে স্বীকার ও প্রতিষ্ঠা করে, আর সংশয়বাদ বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই জ্ঞানের সম্ভব্যতাকে অস্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে এ দুটি পদ্ধতির কোনটিই জ্ঞান অর্জনের জন্য যথার্থ পদ্ধতি নয়। যেমন, প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্ট সম্প্রদায়ের অন্যতম দার্শনিক প্রোটাগোরাসের বিখ্যাত উক্তি "মানুষ সব কিছুর মানদণ্ড"। তার অর্থই হলো যা একজনের কাছে ভাল তা আরেক জনের কাছে মন্দ। সর্বজনীন সত্য বলে কিছুই নেই, সবকিছুই ব্যক্তি নির্ভর।

একইভাবে আধুনিককালের বলিষ্ঠ দার্শনিক ডেভিড হিউম/হিউস জ্ঞানের নিশ্চয়তা ও ব্যাপকতায় সংশয় প্রকাশ করেন যখন তার পূর্ববর্তী দার্শনিক জন লক বলেন, "অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস"। সঙ্গত কারণেই হিউম/হিউস প্রশ্ন তোলেন অভিজ্ঞতাই যদি জ্ঞানের একমাত্র উৎস হয় তাহলে অতীন্দ্রিয় জগতের (আত্মা, জড়, স্রষ্টা) জ্ঞান অর্জন কীভাবে সম্ভব? এভাবে তিনি সংশয়বাদী হয়ে উঠেন।

সমালোচনা:

দর্শনের পদ্ধতি হিসেবে সংশয়বাদ কোন সন্তোষজনক মতবাদ নয়। কেননা দর্শনের লক্ষ্য তত্ত্বালোচনা, নিছক সংশয় নয়। জ্ঞানের সম্ভব্যতা প্রতিষ্ঠার মাঝেই মানুষ তৃপ্ত হয়, সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করাতে নয়। অবশ্য সংশয়বাদী পদ্ধতির ঐতিহাসিক ও দার্শনিক মূল্যকে অস্বীকার করা যাবে না। কারণ দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সংশয়বাদী দার্শনিকগণ বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করাতেই পরবর্তীতে বিচার বিশ্লেষণী পদ্ধতিগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারই ফলে দর্শনের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, আর ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠেছে বিচারনিষ্ঠ দার্শনিক মতবাদসমূহ।

বিচারবাদী পদ্ধতি (Criticism or Critical Theory)

শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, আপনারা ইতোপূর্বের পাঠ থেকে বুঝতে পেরেছেন যে, দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতির হিসেবে নির্বিচারবাদে ও সংশয়বাদ দুটি পদ্ধতিই পরস্পর বিরোধী ও একমুখী বা একতরফা পদ্ধতি। তবে তাদের এই পরস্পর বিরোধীতার সঠিক সমাধান পাবার প্রয়াস থেকেই দর্শনের ইতিহাসে আবির্ভাব ঘটে আরেকটি পদ্ধতির যার নাম বিচারবাদ। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টই এই বিচারবাদী পদ্ধতির প্রধান প্রবক্তা। এ প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করে বলেন যে, "হিউমই আমাকে নির্বিচারবাদী নিদ্রা থেকে জাগিয়েছেন"। কান্টের মতে হিউমের সংশয়বাদ ছিল ত্রুটিপূর্ণ একটি পদ্ধতি যেখানে কোন বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দুটোকেই বিশ্লেষণ করা দরকার তা না করার ফলেই সংশয়বাদের পরিণত হয়েছে। কিছু বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা যে যুক্তভাবে জ্ঞান লাভে সাহায্য করে এবং উভয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠে যথার্থ জ্ঞান তাই কান্ট তার বিচারবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে প্রমান করেন। তিনি তার বিচারবাদে দেখিয়েছেন বুদ্ধি একা কোন জ্ঞান দিতে যেমন পারে না, তেমনি অভিজ্ঞতাও এককভাবে জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারে না; বরং এ দুটির সমন্বয়েই উদ্ভব হয় যথার্থ জ্ঞান। কেন না অভিজ্ঞতা জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহের কাজে সহায়তা দেয়, আর বুদ্ধি তার আকারজাত ও বোধজাত ধারণাগুলোর সমন্বয়ে উপাদানসমূহকে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত করে। আর তখনই সম্ভব হয় যথার্থ জ্ঞান অর্জন। কাজেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা উভয়েরই অবদান রয়েছে যা হিউম উপাদ্ধবিদ্ধ করতে পারেন নি।

এভাবে কান্ট তার বিচারবাদী পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে একদিকে যেমন জ্ঞানের উৎপত্তি ও উৎস নির্ণয় করেছেন, আবার অন্যদিকে তিনি জ্ঞানের উৎপত্তি সীমান্ত নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জগতেই সীমাবদ্ধ, অতীন্দ্রিয় জগতের জ্ঞান লাভ অভিজ্ঞতার জগতেই সীমাবদ্ধ, অতীন্দ্রিয় জগতের জ্ঞান লাভ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর সে কারণে তিনি বলে বস্তুর দৃশ্যমান রূপের জ্ঞানই কেবল পাওয়া সম্ভব। তার বাহিরে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ বা প্রকৃতি জানা আদৌ সম্ভব নয়। তার মতে এই যে, ইন্দ্রিয়জগত যা আমরা আমাদের চারপাশে দেখছি এটা অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতিভাস (Appearance) মাত্র।

সমালোচনা

কান্টের বিচারবাদী পদ্ধতি পূর্ববর্তী পদ্ধতিগুলোর তুলনায় অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত ও বাস্তব সম্মত তা নি:সন্দেহে বলা যায়। কিন্তু তার এ পদ্ধতিতেও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে বলে পরবর্তী অনেক দার্শনিকই মনে করেন। বিশেষ করে কান্ট ইন্দ্রিয় জগতের জ্ঞানকে স্বীকার করেছেন আর অতীন্দ্রিয় জগতের জ্ঞানকে অস্বীকার করেছেন যা তাকে একজন অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic) দার্শনিকরূপে প্রমাণ করে। তাছাড়া অতীন্দ্রিয় জগতের জ্ঞানও যে অর্জন করা সম্ভব তা পরবর্তীতে অনেক দার্শনিকই স্বীকার করেন। তন্মধ্যে হেগেল, শেলিং ও স্বজ্ঞাবাদী আরো অনেক দার্শনিক রয়েছেন। সূফী দার্শনিকগণও তাদের মধ্যে অন্যতম। কেননা তারা আত্মার প্রকৃতি, স্বরূপ ইত্যাদির জ্ঞান অর্জন সক্ষম বলে দায়ী করেন। তবে ত্রুটি বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কান্টের বিচারবাদী পদ্ধতি যে, দার্শনিক বিষয়াদির তথা যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য একটি যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি (Dialetism)

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম পদ্ধতি। কেননা এর মাধ্যমে যথার্থ ও সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। এটির দ্বারা যুক্তির মাধ্যমে যথার্থ ও সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। এটি যুক্তি বা চিন্তার একটি বিশেষ প্রক্রিয়াও বলা যায়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো প্রমুখ এই পদ্ধতির যথেষ্ট প্রয়োগ করেছেন। পরবর্তীতে আধুনিক দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টকেও পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে দেখা যায়। তবে ঐতিহাসিক ও দার্শনিকভাবে পদ্ধতিটি মূলত: জার্মান দার্শনিক ফ্রেডারিক হেগেলের নামের সাথে সর্বাধিক

সংযুক্ত। তার মধ্যে আমাদের যাবতীয় চিন্তা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির কাজই হলো পরস্পর বিরোধী ধারণাগুলোর মধ্যে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। হেগেলের মতানুসারে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ রয়েছে যেমনঃ বাদ (Thesis), প্রতিবাদ (Antithesis) এবং সমন্বয় (Synthesis)। একে বলা হয় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ত্রয়ী (Triad)। মনে রাখতে হবে যে, এ সমন্বয় বা শেষ ধাপে তা থেকে যায় তা নয়, বরং প্রথমবারের মতই পূণরায় তা বাদ (Thesis) আকারে যাত্রা শুরু করে। আর এভাবে বাদ + প্রতিবাদ + সমন্বয়– এ তিনের প্রক্রিয়া ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ না তা পরমতত্ত্বের জ্ঞানে গিয়ে না পৌঁছে। হেগেলের মতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি কেবল মাত্র চিন্তার পদ্ধতিই নয়, এটা সমস্ত জগতেরও পদ্ধতি। তার মতে জড় জগত, ইতিহাস, জীবত্মা, নীতিতত্ত্ব, ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই ক্রমাগত উন্নয়ন ও পরিবর্তন ঘটেছে এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে। বলা যায় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিই জগতের উন্নয়ন ও অগ্রসরতার অন্যতম কারণ। ইতিবাচক এ দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া "হেগেলীয়ান দ্বান্দ্বিক" (Hegelian Diabeitic) পদ্ধতি নামে সুপরিচিত।

অন্যদিকে এই একই পদ্ধতি গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসকেও প্রয়োগ করতে দেখা যায় নেতিবাচকভাবে। সক্রেটিস এ পদ্ধতির প্রয়োগ করে তৎকালীন সোফিষ্টদের মতবাদ খণ্ডন করতেন। এ পদ্ধতিতে তিনি এতোটাই গুরুত্বারোপ করেন যে, এটি 'সক্রেটিস পদ্ধতি' (Socratic Method) নামেও সমধিক পরিচিতি লাভ করে। প্রতিপক্ষের মতবাদের স্ববিরোধিতা করে তা খণ্ডন করার এ প্রক্রিয়া হলো নেতিবাচক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। আর সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্তা নিরূপণ করা হচ্ছে ইতিবাচক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দ্বান্দ্বিকতা বা দ্বান্দ্বিক ও পদ্ধতি দুই ধরনেরই হতে পারে।

১. নেতিবাচক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও ২. ইতিবাচক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি।

সমালোচনা

দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি হিসেবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি একটি যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। তবে এ পদ্ধতি যে সব সময় সর্বত্র প্রয়োগ সম্ভব তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা যে পদ্ধতি চিন্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেই পদ্ধতি পরমসত্তার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যাবে– এ কথা বলা যায় না। হেগেল বুদ্ধির সাহায্যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সত্তার জ্ঞান লাভ সম্ভব বলে মনে করেন। কিন্তু বুদ্ধির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে স্বজ্ঞানবাদিরা বলেন বুদ্ধিতে পরমসত্তার জ্ঞান পাওয়া যায় না বরং স্বজ্ঞার মাধ্যমে তা সম্ভব। তাই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে চিন্তার সকল ক্ষেত্রেই যে প্রয়োগ করার উপযোগী পদ্ধতি তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কেননা এরই ফলশ্রুতিতে কার্ল মার্কস তার জড়বাদে প্রয়োগ করেন ও গড়ে তুলেন বিখ্যাত "দ্বান্দ্বিক জড়বাদ" (Diabectic Materialism) ও সমাজতন্ত্রবাদ।

স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism)

স্বজ্ঞাবাদ দার্শনিক মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা বার্গসোঁ বলেন, বুদ্ধি আমাদেরকে কোন বিষয়ের বিভিন্ন অংশের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় মাত্র তাতে বিষয়ের পূর্ণরূপ বা প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। অর্থাৎ বুদ্ধি কেবল বস্তুর বাহ্যিক দিকটিকেই তুলে ধরে, বস্তুর অন্তর সত্তার কোন জ্ঞান দিতে পারে না। সেটা কেবল স্বজ্ঞাতেই আমরা পাই। তাই স্বজ্ঞাবাদীরা মনে করেন স্বজ্ঞা হলো এক প্রকার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। আর এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিতেই প্রকৃত সত্তা বা পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করা যায়। বার্গসোঁ মনে করেন স্বজ্ঞাই দার্শনিক তত্ত্বালোচনার আসল পদ্ধতি। তিনি স্বজ্ঞার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, এটা হলো বৌদ্ধিক সহানুভূতি (Intellectual Sympathy), যা জ্ঞাতা (Subject) ও জ্ঞেয়বস্তুর (Object) পার্থক্য অতিক্রম করে সামগ্রিক জগত সত্তার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে। বিশিষ্ট দার্শনিক আল্লামা ইকবাল স্বজ্ঞার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, স্বজ্ঞা হৃদয় বা অন্ত:করণের একটি বিশিষ্ট গুণ এবং সে কারণেই তা মন বা বুদ্ধির গুণের চেয়ে আলাদা। মন শুধু বাইরের

জগতকে বুঝতে পারে, স্বগতরূপকে নয়। স্বজ্ঞার সাহায্যে মানুষ বস্তুর প্রকৃত রূপকে জানতে পারে। স্বজ্ঞা একটি অবিশ্লেষণযোগ্য মানুষ জ্ঞানে বস্তুর প্রকৃতরূপকে। স্বজ্ঞা একটি অবিশ্লেষণযোগ্য সমগ্র। এর মধ্যে বিষয় ও বিষয়ীকে পৃথক করা যায় না। কারণ এখানে বাস্তব সত্তাকে সমগ্ররূপে উপস্থাপন করা হয়। একটি অবিভক্ত বিষয় হিসেবে তা প্রতিভাত হয়। আর সে জন্যই এই জ্ঞানকে অপরের কাছে হস্তান্তর করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আত্মগত হলেও এ ধরনের জ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ উপাত্ত রয়েছে বটে। আর সে জন্যই মরমী অভিজ্ঞতা যা কিনা স্বজ্ঞার মাধ্যমে প্রাপ্ত তা বাস্তব ও অস্তিত্ব বিষয়ক।

সমালোচনা

বিশ্লেষণী পদ্ধতি (Analytic Method)

সনাতনী দর্শনের স্বরূপ, পদ্ধতি ও প্রকৃতি নিয়ে সমালোচনা ও বিরোধিতা করে সমকালীন দার্শনিকগণ বলেন বিশ্লেষণই দার্শনিক সমস্যাবলির আলোচনার আসল পদ্ধতি। বিশ্লেষণধর্মী দার্শনিক সম্প্রদায় মনে করেন যথার্থ জ্ঞান অন্বেষণই যদি দর্শনের কাজ হয় তবে দর্শনের আলোচনায় অবশ্যই বিশ্লেষণের সাহায্য নিতে হবে এবং তারা দার্শনিক সমস্যাবলির সমাধান যথার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে করতে প্রয়াস পান। সেক্ষেত্রে বিশ্লেষণী দার্শনিক ম্যুর ভাষার সাধারণ ব্যবহার, অর্থাৎ ভাষা বিশ্লেষণ এবং শব্দ ও ধারণার বিশ্লেষণের উপরেও গুরুত্বারোপ করেন। ভিটগেনষ্টাইন, মরিসশ্লিক. এ. জে. এয়ার প্রমুখ বিশ্লেষণী পদ্ধতির অনুসারী।

এ কথা ঠিক যে, নৈর্ব্যক্তিক ও যথার্থ জ্ঞানের অনুসন্ধানে বিচার বিশ্লেষণের সাহায্য নেয়া একান্ত কাম্য। তাতে করে দার্শনের আলোচ্য বিষয়াদির দ্ব্যার্থকতা ও অস্পষ্টতা দূর হয়ে তা পরিস্কার ও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। নিছক অন্ধ বিশ্বাস বা নির্বিচারী পদ্ধতিতে যথার্থ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। সেদিক থেকে বিশ্লেষণী পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা অন্য সব পদ্ধতির তুলনায় এটা অনেক বেশি যৌক্তিক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পূর্ববর্তী ধারণার বশবর্তী হয়ে একজন দার্শনিক যখন কোন সমস্যার সমাধান করেন তাকে কী পদ্ধতি বলে?
   ক. নির্বিচারবাদ
   খ. বিচারবাদ
   গ. সবিচারবাদ
   ঘ. কোনটিই নয়

২. সংশয়বাদী পদ্ধতির প্রধান প্রবক্তা কোন দার্শনিক?
   ক. রেনে দেকার্ত
   খ. ইমানুয়েল কান্ট
   গ. বার্ট্রান্ড রাসেল
   ঘ. রুশো

৩. "মানুষই সব কিছুর পরিমাপক বা মানদণ্ড"– উক্তিটি কার?
   ক. থেলিস
   খ. এনাক্রাগোরাস
   গ. প্লোটাগোরাস
   ঘ. কেউই নয়

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ক, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. বিচারবাদ ও নির্বিচারবাদের মূল পাথ্যক্য কী?
২. দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়?
৩. সংশয়বাদের মূল বক্তব্য কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. নির্বিচারবাদী পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। এই পদ্ধতির ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরুন। একে কী সন্তোষজনক পদ্ধতি বলা যায়?
২. সংশয়বাদী পদ্ধতির প্রধান প্রধান প্রবক্তার বক্তব্য তুলে ধরুন।
৩. বিচারবাদ বলতে কী বুঝায়? এই পদ্ধতি কী সন্তোষজনক পদ্ধতি? মতামত দিন।
৪. দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির উদ্ভাবক কে? দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করুন।

পাঠ- ১.৪: জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ, জ্ঞানের স্বরূপ ও বিষয়বস্তু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জ্ঞানতত্ত্ব বলতে কী বুঝায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জ্ঞানের উৎপত্তি কীভাবে হয় তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- জ্ঞান উৎপত্তিতে বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ, স্বজ্ঞাবাদ, ভাববাদ ও বাস্তববাদের ভূমিকা কী তা বলতে পারবেন।

দর্শন ও শিক্ষা দর্শন

দর্শন ও শিক্ষা দর্শন এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তার অনেকাংশ জুড়ে আছে জ্ঞান উৎপত্তি সম্পর্কিত আলোচনা। কেন না শিক্ষা বলতে আচরণের যে কাঙ্ক্ষিত ইতিবাচক পরিবর্তনকে বুঝায় তা কিন্তু নতুন নতুন জ্ঞানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত ও প্রভাবিত হয়। কোন অজানা বিষয়কে জানার আগ্রহ থেকেই যেমন কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জিত হয়, তেমনি তার প্রভাবে প্রভাবিত হলেই শিক্ষার্থীর আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আসে অর্থাৎ শিখন কাজ সম্পন্ন হয়। কাজেই শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানার জন্য জ্ঞান কী, কিভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে তা জেনে নেয়া আবশ্যক।

জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসেবে বুদ্ধিবাদ (Rationalsim), অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism), স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionsim) ও প্রয়োগবাদ (Pragmatism)-এর আলোচনায় যাবার আগে জ্ঞানতত্ত্ব বলতে কী বুঝায় তা জেনে নেব। ইংরেজি "Epistemology" শব্দটি যথাক্রমে গ্রীক শব্দ "Eposteme" ও "Logos" থেকে উদ্ভূত হয়েছে। Episteme-এর বাংলা অর্থ জ্ঞান যাকে আমরা "Knowledge" ও বলে থাকি। আর "Logos" শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে বিজ্ঞান বা বিদ্যা। কাজেই উৎপত্তিগত দিক থেকে "Epistemology" শব্দটির সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায় "জ্ঞানতত্ত্ব" বা "জ্ঞান বিদ্যা"। এটি দর্শনের একটি অন্যতম প্রধান শাখা। জ্ঞানতত্ত্ব মূলত: যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাহলো (১) জ্ঞানের উৎপত্তি বা উৎস কোথা থেকে? (২) জ্ঞানের স্বরূপ কী? এবং (৩) জ্ঞানের বৈধতা বলতে কী বুঝায়?-এ তিনটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দার্শনিকগণ যে মতবাদগুলো প্রণয়ন করেছেন সে মতবাদগুলোর আলোচনাই এই পাঠের মূল উদ্দেশ্য। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত দর্শনের ইতিহাস পাঠ থেকে জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক সে মতবাদগুলো আমরা জানতে পারি সেগুলো হলো– (১) বুদ্ধিবাদ (২) অভিজ্ঞতাবাদ (৩) বিচারবাদ ও (৪) স্বজ্ঞাবাদ। নিচে আমরা পর্যায়ক্রমে সেগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করব।

বুদ্ধিবাদ (Rationalism)

বুদ্ধিবাদের প্রধান প্রবক্তা প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল। এটি জ্ঞান উৎপত্তি সম্পর্কীয় এমন একটি মতবাদ যার অনুসারীগণ সকলেই মনে করেন যে, বুদ্ধি (Reason)-ই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, কেননা স্বজ্ঞান অভিজ্ঞতা যে জ্ঞান দেয় তা সর্বজন গ্রাহ্য নয়। যথার্থ জ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো সর্বজন গ্রাহ্যতা। আর সর্বজন গ্রাহ্যতা কেবল বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানেই অর্জিত হয়। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত জ্ঞান সদা পরিবর্তনশীল। যেমন– ২ + ২ = ৪ এটা আমরা বুদ্ধিতে পাই যা সর্বজন গ্রাহ্য জ্ঞান।

আর এটা বোঝার জন্য স্বজ্ঞা অভিজ্ঞতার দরকার হয় না, দরকার শুধু বুদ্ধির। এ জাতীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষপূর্ব (Apriori) এবং বিশ্লেষণাত্মক (Analitical)।

আধুনিক কালের বুদ্ধিবাদী ফরাসী দার্শনিক দেকর্ত বলেন, "আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি"। তাঁর বিখ্যাত উক্তি দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন চিন্তা বা বুদ্ধিই প্রকৃত জ্ঞানের উৎস। আমাদের সহজাত ধারণা থেকে জ্যামিতিক অবরোহ পদ্ধতি অবলম্বনে জ্ঞান লাভ করে থাকি। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক স্পিনোজাও দেকার্তের ন্যায় সহজাত ধারণার বিশ্বাসী ছিলেন। দেকার্ত ধারণাকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেন, (১) সহজাত ধারণা (Innate Ideas), (২) আগন্তুক ধারণা (Adventitious Ideas) এবং (৩) কৃত্রিম ধারণা (Fictitious Ideas)। মানুষকে যে ধারণা নিয়ে জন্মায় তাকে বলে সহজাত ধারণা। আর সহজাত ধারণা কাল্পনিক বা সন্দেহজনক কিছু নয়। তাই দেকার্ত মনে করেন, একমাত্র সহজাত ধারণা থেকেই জ্যামিতিক অবরোহ পদ্ধতিতে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। দার্শনিক স্পিনোজাও সহজাত ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তাঁর Cogitata Metaphysica গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন। মোট কথা দেকার্ত ও সিপনোজা– দু'জনেই উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিগত দিক থেকে একই মত পোষণ করেন। তবে অপর একজন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক লাইব নজি তাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন, মানুষ কোন ধরনের সহজাত ধারণা নিয়ে জন্মায় না, তবে তার কতকগুলো সহজাতস্থ প্রবণতা (Innate Apptitude) রয়েছে, যেগুলো সুপ্তাবস্থায় মানবগণে অবস্থান করে। বুদ্ধি সেগুলোকে ক্রমান্বয়ে বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে স্পষ্ট করে তোলে। তবে লাইব নিজ স্বীকার করেন যে, বুদ্ধি যে জ্ঞান দেয় তা অনিবার্য সত্য যা অগ্রাহ্য হারে নয়। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ভলবও বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকেই যথার্থ বলে মনে করেন এবং অবরোহ পদ্ধতিতে জ্ঞান আহরণের কথা বলেন। বুদ্ধিবাদের উক্ত আলোচনা থেকে নির্দ্বিধায় আমরা বুদ্ধিবাদের কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে পারি–

১. **অবরোহমূলক:** বুদ্ধিবাদীগণ মনে করেন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান নিয়ত পরিবর্তনশীল ও অনিশ্চিতা কিন্তু বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান নিশ্চিত। কেননা বুদ্ধিবাদ গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে আরোহমূলক পদ্ধতিতে নিশ্চিত জ্ঞান লাভের পথ দেখায়।
২. **সহজাত ধারণা ও প্রবনাকে প্রাধান্য:** সহজাত ধারণা প্রসূত অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণায় বিশ্বাসী। অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত ধারণা স্বত:সিদ্ধ ও নির্ভুল জ্ঞান দিতে পারে না বলে বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন। এই সহজাত ধারণা বা প্রবণতাকেই যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তি মনে করেন তারা।
৩. **সর্বজনীনতা:** বুদ্ধিবাদীগণ মনে করেন আরোহমূলক বা গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করায় বুদ্ধিতে প্রাপ্ত জ্ঞান সমন্বয় সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে থাকে। এখানে সহজে সংশয় বা অস্পষ্টতা থাকে না তাই বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান নিশ্চিত।
৪. **নিশ্চিয়তাপূর্ণ জ্ঞান:** বুদ্ধিবাদীগণ মনে করেন যথার্থ ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের উৎস হলো বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতাপূর্ণ সহজাত ধারণা ও প্রবণতা যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করা যায় না। তাই বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান সবসময় সন্দেহমুক্ত ও শ্বাশত।

অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism)

অভিজ্ঞতাবাদ জ্ঞান উৎপত্তি সম্পর্কে এমন একটি মতবাদ যার অনুসারীগণ মনে করেন অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। অভিজ্ঞতাবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এটি বুদ্ধিবাদের মতই একটি প্রাচীন মতবাদ। প্রাচীন গ্রীসের সোফিস্ট সম্প্রদায় ও পরমানুবাদী দার্শনিকগণ এর সর্বপ্রথম প্রবক্তা। প্রয়োগবাদী দার্শনিক প্রোটাগোরাম ৪৮০-৪১০ খ্রী. মনে করতেন যে, "ব্যক্তি মানুষই সব কিছুর পরিমাপক বা নির্ধারক"। অর্থাৎ ব্যক্তির অভিজ্ঞতাই তার সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের মাপকাঠি। তারা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণকেই জ্ঞান লাভের একমাত্র মাপকাঠি। মধ্য যুগে কোন অভিজ্ঞতাবাদীর আর্বিভাব ঘটতে দেখা যায় না। তবে তাদের হাতে অভিজ্ঞতাবাদের গোড়াপত্তন হলেও আধুনিক কালের বহু দার্শনিকই এর অনুসারী। তন্মধ্যে ফ্রান্সিস বেকন, থমাস হবস, জন লক, বিশপ জজ

বাকলী এবং ডেভিড হিউম উল্লেখযোগ্য। অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন, অভিজ্ঞতাপূর্ণ সহজাত ধারণা বা স্বত:সিদ্ধ ধারণা বলে কিছুই নেই। তবে ইন্দ্রিয় সংবেদন অথবা অন্ত:দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা যায়। ইন্দ্রিয় সংবেদ আমাদেরকে বাইরের জগতের জ্ঞান দান করে। আর অন্ত:দর্শন মনোজগতের জ্ঞান দিতে থাকে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের সাহায্যে প্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ ধারণাগুলোর সাথে পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমে একটা সংযোগ তৈরি হয়। আর তাতে করে সরল ধারণাগুলোই একটা জটিল ধারণা গড়ে তোলে। এভাবে আরোহ পদ্ধতিতে আমরা জ্ঞান লাভে সক্ষম হই।

অভিজ্ঞতাবাদী লক তাঁর, "An Easy Conecrning Human Understanding" গ্রন্থে বলেন, মানুষ জন্মের সময় কোন ধারণা নিয়ে জন্মায় না, বরং জন্মলগ্নে তার মন থাকে সাদা কাগজের মতন। কিন্তু সে যখন বাইরের জগতে প্রবেশ করে তখন তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহু রকম সংবেদন সৃষ্টি হয় এবং মনে নানা রকম ছাপ পড়ে। এ সকল সংবেদনই হচ্ছে জ্ঞানের ভিত্তি। তার মতে মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দুটি দিক রয়েছে একটি হলো সংবেদন (Sensation) ও অপরটি হলো অন্ত:দর্শন (Reffection)। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বর্হিজগতের ধারণাগুলো হলো সংবেদন। আর তা যে মানসিক অবস্থার মাধ্যমে হয় তাহলো অন্ত:দর্শন। তবে সবসময় মনে রাখতে হবে সংবেদন অন্ত:দর্শনের পূর্বগামী। আর তাই লক বলেন, "মনের মধ্যে এমন কিছুই নেই যা পূর্বে ইন্দ্রিয়ে ছিল না"।

উল্লেখ্য, জন লক একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হলেও তিনি দ্রব্য, স্রষ্টা ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তার দর্শনের এদিকটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে বার্কলীর জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ যা বার্কলির আত্মগত ভাববাদ নামে খ্যাত। তিনিও জন লককে অনুসরণ করে বলেন, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণই জ্ঞানের একমাত্র উৎস এবং জগতের সকল বস্তুই সংবেদন ও ধারণার সমষ্টি মাত্র। কাজেই মন বহিভূর্ত কোন ধারণা নেই। সংবেদনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, অর্থাৎ অস্তিত্ব ও প্রত্যক্ষ অভিন্ন বিষয়। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, যখন আমি কোন ঘরে একটি টেবিলে লিখছি তখন তা অস্তিত্বশীল। আর আমি তখন বুঝতে চাই যে, টেবিলটি আমি দেখছি ও অনুভব করছি। কিন্তু যখন আমি বাইরে থাকি তখনও টেবিলটি অস্তিত্বশীল, তখন আমি বুঝতে চাই যে, যদি আমি ঘরে থাকতাম তাহলে হয়তো তা প্রত্যক্ষ করতাম। কাজেই "অস্তিত্বশীল হওয়া মানেই প্রত্যক্ষিত হওয়া।" (Thilly, 1957, পৃ. ৩৬০)।

পরবর্তীতে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) বার্কলির "অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর"- এ উক্তিটিকে স্বীকার করে নিয়ে জ্ঞান উৎপত্তি সম্পর্কে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ মূলত: 'সংশয়বাদ' নামে অধিক পরিচিত। কেননা তিনি সব ধরনের জ্ঞানকেই সম্ভাব্য বলে স্বীকার করেন। এমন কি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও সম্ভাব্য মাত্র। হিউমের মতে স্বত:সিদ্ধ জ্ঞান বলতে যা বুঝায় তা কেবল গাণিতিক ক্ষেত্রেই সম্ভব। কেননা গণিতই পারে সার্বিক ধারণাকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে, অন্য কোন বিষয় নয়। হিউমের মতে আমরা যা কিছুই জানি তা ইন্দ্রিয় ও ধারণার মাধ্যমেই জানি। আর এক্ষেত্রে যা অর্জিত হয় তা সম্ভাব্য মাত্র তার মতে জ্ঞানের উপাদান হলো প্রত্যক্ষণ, যাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– ইন্দ্রিয়জ (Impression) এবং ধারণা (Idea) ইন্দ্রিয়জ আবার দু'ধরনের হয়, যথা– সংবেদনের ইন্দ্রিয়জ (Impressions of Sensation) এবং অন্ত:দর্শনের ইন্দ্রিয়জ (Impression of Reffection)। অন্ত:র্দশনের ইন্দ্রিয়জ গৌণ। এটা সবসময় ইন্দ্রিয়জ সংবেদনের পরে আসে। মূলত: ইন্দ্রিয়জ সংবেদন ও ধারণা পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিষয়। কিছু অনুষঙ্গের নিয়মানুযায়ী সেগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয়। অনুষঙ্গের নিয়মগুলো হলো– (১) সাদৃশ্য নিয়ম (Law of similasity), (২) সান্নিধ্য নিয়ম (Law of Contiguity) এবং (৩) কার্যকরণ নিয়ম (Low of Cousation)।

উপরোক্ত নিয়মগুলো অনুসরণ করেই প্রতিটি সরল ধারণা আরেকটি ধারণার সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে। আর অনেকগুলো সরল ধারণার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে জটিল ধারণা। তাই হিউমের মতে সরল ও জটিল ধারণার সমন্বয়েই গড়ে ওঠে জ্ঞান।

বিংশ শতাব্দির অন্যতম দার্শনিক ও যৌক্তিক দৃষ্টবাদের প্রধান প্রবক্তা এ. জে. এয়ার জ্ঞানের উৎসরূপে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষণকেই নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে দু'ধরনের বচনকে অর্থ পূর্ণ (Meaning ful) বা ানমূলক বলা যেতে পারে। সেগুলো হলো (১) সংশ্লেষক প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ (Synthetic a posteriora) বচন এবং (২) বিশ্লেষক প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ (Analytic a priori) বচন। এর পক্ষে তিনি যুক্তি দেন যে, প্রথম শ্রেণির বচনগুলো ইন্দ্রিয়ানুভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি অর্থাৎ তা পরোক্ষযোগ্য বা যাচাইযোগ্য। তাঁর মতে বচন অর্থ পূর্ণ হতে হলে তা অবশ্যই ইন্দ্রিয়ানুভবে পরোক্ষযোগ্য হতে হবে। আর সেদিক থেকে বিচার করলে এয়ারের মতানুসারে নীতিবিদ্যা বা নীতিবাক্যসমূহ ও অধিবিদ্যার বচনগুলো অর্থহীন। কেননা এগুলো ইন্দ্রিয়ানুভবে পরোক্ষযোগ্য নয়। আর যেসব বচন পরোক্ষযোগ্য নয় তা ছদ্ম বচন, যাদের কোন জ্ঞানমূলক অর্থ নেই।

বিচারবাদ (Critical Theory of Knowledge)

জার্মান দার্শনিক কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)-এর দর্শন বিচারবাদ নামে পরিচিত। তিনি অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে Critique of pure reason, Critide of Practical Reason, Prolegomea প্রভৃতি। তাঁর জ্ঞান সম্পর্কীয় মতবাদটিই 'বিচারবাদ' নামে পরিচিত। তবে এটিকে 'সমন্বয়বাদী জ্ঞান সম্পর্কীয় মতবাদ' নামেও অভিহিত করা হয়। কেননা তার এ মতবাদ বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের এক অপূর্ব সমন্বয়েই গড়ে ওঠেছে। তিনি জ্ঞান সম্পর্কে বুদ্ধিবাদ দ্বারা প্রথম দিকে প্রভাবিত ছিলেন এবং বুদ্ধিকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বীকার করেন এবং যৌক্তিকতাও প্রতিপাদন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ডেভিড হিউমের অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন অধ্যয়নের পর তাঁর চিন্তায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তিনি শীঘ্রই উপলব্ধি করলেন যে, যথার্থ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা এদের কোনটিই এককভাবে তা দিতে পারে না বরং উভয়ের কল্যাণেই প্রকৃত জ্ঞান পাওয়া যায়। তাই তিনি বলেন, "হিউম আমাকে (বুদ্ধিবাদের) নির্বিচারী নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলেন"।

কান্টের মতে যথার্থভাবে জ্ঞান লাভের জন্য বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা উভয়টিই দরকার। কেননা জ্ঞানের দুটি দিক রয়েছে, একটি হলো উপাদান, অপরটি আকার। কান্ট মনে করেন, আমরা জ্ঞানের উপাদান লাভ করি অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে। কিন্তু জ্ঞানের আকার, যেমন- দেশ (Space), কাল (Time) ইত্যাদি পাই বুদ্ধির মাধ্যমে।

আর এগুলো সবসময় অভিজ্ঞতাপূর্ণ (A Priori) বিষয়, অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় নয়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, অভিজ্ঞতালব্ধ সংবেদন যেমন স্বয়ং কোন জ্ঞান নয়, তেমনি বুদ্ধিতে নিহিত মৌলিক ধারণাগুলোও স্বয়ং জ্ঞান নয়। জ্ঞানের জন্য দু'টিই অপরিহার্য। উভয়ের সংযোগ ও সমন্বয়েই জ্ঞান গঠিত হয়। এ কারণেই কান্ট মন্তব্য করেন, "ইন্দ্রিয় সংবেদন ভিন্ন বুদ্ধি নিছক শুন্য গর্ভ এবং বুদ্ধি ভিন্ন সংবেদন অন্ধ"।

কান্ট সে শুধু বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের সমন্বয় সাধন করেছেন তাই নয়, এ দু'টি মতবাদে ব্যবহৃত পদ্ধতির মাঝেও সমন্বয় সাধন করেন। বুদ্ধিবাদে ব্যবহৃত অবরোহ পদ্ধতিতে জ্ঞান যেমন সার্বিকতা লাভ করে তেমনি অন্যদিকে, অভিজ্ঞতাবাদে ব্যবহৃত আরোহ পদ্ধতি প্রয়োগে জ্ঞানের গভীরতা ও প্রসার না বৃদ্ধি পায়। আর যথার্থ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে দুটি বিয়ষই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কান্ট তার বিচারবাদে এমন একটি নীতিমালার কথা বলেন যা একদিকে জ্ঞানের প্রসার সাধন করে এবং অন্যদিকে জ্ঞানের সার্বিকতারও নিশ্চয়তা প্রদান করে। আর এখানেই কান্টের বিচারবাদের সফলতা।

স্বজ্ঞাবাদ (Intutionism)

জ্ঞান উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসেবে স্বজ্ঞাবাদও একটি প্রাচীন মতবাদ, বিশেষ করে মরমীবাদী দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ এ মতের অনুসারী। মধ্য যুগের মুসলিম দর্শনে সূফী দার্শনিকবৃন্দ স্বজ্ঞাকেই জ্ঞানের উৎস ও মাধ্যম বলে গণ্য করেন। পরম সত্তা আল্লাহর জ্ঞানসহ অন্যান্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান এ পথেই লাভ করা যায়, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় নয়। বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম আল-গাযানী, আল ফারাবী, মনসুর হাল্লাজ, হাসান বসরী, তাপসী রাবেয়া বসরী প্রমুখ এ পথেই জ্ঞান অর্জন করেছেন। আধুনিক কালের দার্শনিক হেনরী বার্গসোঁ (১৮৫৯-১৯৪১) স্বজ্ঞার উপরেই বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর জন্ম প্যারিসে এবং সেখানেই তিনি লেখাপড়া শেষ করে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন ও ১৯২৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি ধর্ম, দর্শন, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে Trime and fre will, matter and memory, introduction to metaphysics, creative evaluation প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আধুনিককালে স্বজ্ঞাবাদকে তিনিই জনপ্রিয় করে তোলেন। এখন স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটি আসে তাহলো 'স্বজ্ঞা' বলতে আসলে কি বোঝায়? বাগসোর মতে "স্বজ্ঞা একটি অন্যবদ্য বৌদ্ধিক সমবেদন।" বুদ্ধি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে না। বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রভৃতি বাহ্যিক ও পরিমাণগত দিক তুলে ধরে। বস্তুর আসল রূপের পরিচয় দেয় না। এ জাতীয় জ্ঞান পরোক্ষ কিছু স্বজ্ঞায় প্রাপ্ত জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান যেখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়) এ দু'য়ের মাঝে কোন ব্যবধান থাকে না। ফলে এক অনবদ্য অনুভূতি তৈরি হয়। এ প্রত্যক্ষ অনুভূতির নামই স্বজ্ঞা। এ জন্য স্বজ্ঞাবাদী প্যাট্রিক বলেন, "স্বজ্ঞা হলো একটি জ্ঞানীয় অনুভূতি যা তাৎক্ষণিকভাবে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত করে"। স্বজ্ঞাবাদের পক্ষে নিম্নরূপ যুক্তি তারা প্রদান করেন।

১. বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান আংশিক, আর স্বজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান সামগ্রিক। কেননা বুদ্ধি সমগ্রকে খণ্ড খণ্ড আকারে বোঝার চেষ্টা করে। বুদ্ধির প্রকৃতিই হচ্ছে বিশ্লেষণী আর স্বজ্ঞা খণ্ডাকারে নয় সমগ্রাকারে বস্তুকে অবলোকন ও উপলব্ধি করে।

২. স্বজ্ঞা সত্তার প্রকৃত জ্ঞান প্রদানে সক্ষম। কিন্তু বুদ্ধি কেবল বাহিক্য ও প্রাতিভাসিক জ্ঞান প্রদান করে।

৩. বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ব্যক্তি ভেদে বিভিন্ন হয়। কেননা এতে ব্যক্তির রুচি, মেধা, মনন প্রভৃতি বিষয় কাজ করে, ফলে এ জাতীয় জ্ঞান আপেক্ষিক। কিন্তু স্বজ্ঞায় প্রাপ্ত জ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যেখানে এক বস্তুর সাথে আরেক বস্তুর মিল বা গরমিল লক্ষ্য করা হয় না। স্বজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান সরাসরি পাওয়া যায়।

৪. স্বজ্ঞার মাধ্যমে পরম সত্ত্বার জ্ঞান লাভ করা যায়, বুদ্ধিতে তা কখনোই সম্ভব নয়। স্বজ্ঞা সরাসরি বস্তুর ভেতরে প্রবেশ করে কিন্তু বুদ্ধিতে তা সম্ভব নয়।

৫. বুদ্ধি সাধারণ ধারণার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু বস্তুর পূর্ণরূপ সাধারণ ধারণায় ধরা পরে না। তাই বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা তুলে ধরে বার্গসোঁ বলেন, বুদ্ধি নয়, যথার্থ জ্ঞান কেবল স্বজ্ঞাই দিতে সক্ষম।

জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে যে মতবাদগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু জ্ঞানতত্ত্ব কেবল জ্ঞানের উৎপত্তি নিয়েই আলোচনা করে তা নয় বরং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনকারী ও জ্ঞানের বিষয় এ দু'টির মাঝে অন্তর্নিহিত সম্পর্কটা কেমন হয়ে থাকে সে বিষয়েও জানা দরকার। জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ কী, এটা মন নিরপেক্ষ না কী মন নির্ভর ধারণা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জানতে পারলেই কেবল জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা পরিপূর্ণতা লাভ করবে জ্ঞানতত্ত্বে এ বিষয়ে অবশ্য পরস্পর বিরোধী মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। মতবাদ দুটি হলো– (১) বাস্তববাদ (Realism) এবং (২) ভাববাদ Idealism)।

বাস্তববাদ (Realism)

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বাস্তববাদী দার্শনিকগণ বলেন, জ্ঞেয় বস্তুর মন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, যা কোনভাবেই মনের উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ কোন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার অর্থ এটা নয় যে, আমরা তাকে জানতে পারলাম বলেই তা সৃষ্টি হলো, বরং প্রকৃত সত্য হলো বস্তুটি পূর্বেই অস্তিত্বশীল ছিল। জ্ঞাতার ন্যায় জ্ঞেয় বস্তুরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। তাই সকল বাস্তববাদীই স্বীকার করেন যে, বস্তুর জ্ঞান নিরপেক্ষ বা মন নিরপেক্ষ নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে, জ্ঞানের সাথে যার কোন অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নেই। তবে বস্তু জ্ঞান থেকে কতটুকু স্বতন্ত্র এবং কীভাবে বস্তুকে জানা যায়– সে বিষয়ে সকল বাস্তববাদী একমত নন। আর তাদের এ মতানৈর্কের কারণে বাস্তববাদকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১. সরল বাস্তববাদ (Naive Realism)
২. বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ বা প্রতীকবাদ (Representative Realism)
৩. নব্য বাস্তবাদ (New Realism) এবং
৪. নব্য সবিচার বাস্তবাদ (New Critical Realism)।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এখন বাস্তববাদের বিভিন্ন প্রকারভেদ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

১. **সরল বাস্তববাদঃ** একে লৌকিক বাস্তববাদও বলা হয়। সাধারণ মানুষের সরল ধারণাই এতে ফুটে উঠেছে। সরল বাস্তববাদ তাই বাস্তববাদের সহজতম রূপকে প্রকাশ করে। সরল বাস্তববাদ অনুসারে বাইরের জগতের সকল বস্তুর মন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এবং বস্তুর যে গুণগুলো রয়েছে সেগুলো বস্তুতেই বিদ্যমান থাকে। বস্তুর এ গুণসমূহ আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানি। এতে কোন রকম প্রতিবিশ্ব বা মাধ্যম প্রয়োজন হয় না। এক কথায়, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সোজাসুজি বস্তুকে তার গুণাবলীসহ জানতে পারি। এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ নয়। তাই এ মতবাদকে জ্ঞানভিত্তিক একত্ববাদও বলা হয়।
২. **বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ বা প্রতিরূপী বাস্তববাদঃ** প্রখ্যাত দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪) বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের প্রধান প্রবক্তা। তিনি মূলত: সরল বাস্তববাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দূর করে বাস্তববাদকে একটি বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। লকের মতানুসারে বস্তুর মন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তবে আমরা তাকে সরাসরি জানতে পারি না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর বাইরের বস্তুর যে ছাপ বা প্রতীক ভেসে ওঠে তা মনে এক ধরনের দাগ কাটে আর এ প্রতীক বা ধারণার মাধ্যমেই জ্ঞান তৈরি হয়। অর্থাৎ বস্তুর প্রতীককে আমরা সরাসরি জানতে পারি, বস্তুকে নয়। তাই একে প্রতিরূপী বাস্তববাদও বলা হয়। তার মানে এ জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান।

   লকের মতে বস্তুর দু'ধরনের গুণ রয়েছে, মূখ্য গুণ ও গৌণ গুণ। মুখ্য গুণগুলো বস্তুতেই বিদ্যমান এগুলোর মন নিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু গৌণ গুণগুলোর কোন বস্তুনিষ্ঠ ধর্ম নেই, তা নিতান্তই ব্যক্তিগত। ব্যক্তি মনের সৃষ্ঠ সংবেদন মাত্র। যেমন– বস্তুর গতি, আকার, আয়তন, ওজন সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদিকে বলা হয় মূখ্য গুণ যেগুলো বস্তুতেই বিদ্যমান থাকে এবং একইরূপে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে। কিন্তু রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ ইত্যাদি হচ্ছে বস্তুর গৌণ গুণ, যেগুলো ব্যক্তি ভেদে বিভিন্ন হয়। এগুলো তাই ব্যক্তি সাপেক্ষ। লকের মতে গৌণগুণগুলো বস্তুর প্রকৃত গুণ নয়, এগুলো মূখ্য গুণের সংবেদন মাত্র। মুখ্য গুণই গৌণগুনের সংবেদন সৃষ্টি করে। আর মুখ্যগুণের আধাররূপেই বস্তুর মন নিরপেক্ষ অস্তিত্ব বিদ্যমান। সরল বস্তুবাদের সাথে বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের পার্থক্য হলো সরল বাস্তববাদীরা মনে করে সরাসরি আমরা বস্তুকে জানতে পারি তাই এটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ অনুসারে আমরা বস্তুর মূখ্যগুণগুলোকে সরাসরি জানতে পারি আর এ গুণগুলো আমাদের মনে যে প্রতীক বা ছাপ তৈরি করে তার ফলে পরোক্ষভাবে বস্তুকে আমরা জানতে পারি। তাই এটা পরোক্ষ জ্ঞান।

৩. **নব্য বাস্তববাদ (New Realism):** নব্য বাস্তববাদ ব্রিটেন ও আমেরিকার একটি জনপ্রিয় দার্শনিক মতবাদ। এ মতবাদের আর্বিভাব ঘটে মূলত: বার্কলীর ভাববাদ, হেগেল ও ব্রাজলীর পরমব্রক্ষ্মবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ স্বরূপ। ব্রিটেন এ মতবাদের অনুসারী হলেন ম্যুত্তর, আলেকজান্ডার ও বার্ট্রান্ড রাসেল এবং আমেরিকায় এ নব্যবাস্তবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন হোল্ট, মডিন, মন্টেগো, পেরী, পিটকিন ও স্পাউলডিং। ১৯৯২ সনে তারা The New Realism নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

নব্য বাস্তবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১. নব্য বাস্তববাদীদের মতানুসারে আমরা সরাসরি বস্তুকে জানতে পারি এর জন্য কোন প্রকার ধারণা বা প্রতীকের প্রয়োজন নেই।
২. নব্য বাস্তববাদীগণ বহুত্ববাদী। কেননা তাঁরা মনে করেন জগতে অসংখ্য স্বাধীন বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাদের মধ্যকার যে সম্পর্ক তা নিছক বাহ্যিক নয়, বরং অভ্যন্তরীণ ও স্থায়ী।
৩. নব্য বাস্তববাদীদের মতে শুধু বস্তুর মূখ্যগুণগুলোই বাস্তব তা নয় গৌণগুণগুলোও বাস্তব এবং অস্তিত্বশীল। কেননা গৌণ গুণগুলোকেও মূখ্যগুণের ন্যায় আমরা প্রত্যক্ষ করি। আর তাই এদের মধ্যকার সম্পর্কও বাস্তব।
৪. নব্য বাস্তববাদ অনুসারে জগতের ভেতরে কতকগুলো নিরপেক্ষ স্বাধীন পদার্থ রয়েছে, আর সেগুলোই জগতের মূল সত্তা। সেগুলো দেশ কালের গণ্ডিতে কার্য কারণ সম্বন্ধ দ্বারা সম্পৃক্ত হলেই গড়ে ওঠে অস্তিত্ব সম্পন্ন জড়াগত।

নব্য বাস্তববাদের প্রধান প্রবক্তা ম্যুর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Refutation of Idalism"-এর ভেতরে বার্কলীর ভাববাদের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, বার্কলীর যে উক্তির উপর তার ভাববাদ প্রতিষ্ঠিত তা হলো "অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর" (Esseest Percipii)। উক্তিটি অযৌক্তিক ও অবাস্তব। কেননা বস্তুর অস্তিত্ব বা সত্তা আছে বলেই আমরা তা প্রত্যক্ষ করি। কাজেই অস্তিত্ব প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর নয়। বস্তুর অস্তিত্ব না থাকলে তাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবই হত না। তিনি আরও বলেন জ্ঞানের বিষয় না থাকলে যেহেতু জ্ঞান সম্ভব নয়, তেমনি সংবেদনের বিষয় না থাকলে সংবেদন লাভ করা যায় না। কাজেই বস্তু ও সংবেদন একই বিষয় নয়। সংবেদনের বিষয়কে স্যুত্তর ইন্দ্রিয়োপাত্ত নাম দেন। এই ইন্দ্রিয়োপাত্ত হচ্ছে জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞান নয়। এ প্রসঙ্গে ব্রার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর The Problems of Philosophy গ্রন্থে যা বলেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনিও ম্যুর এর সাথে ঐক্যমত পোষণ করে বলেন, জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র। আর সংবেদনে যা সরাসরি পাওয়া যায় তাই ইন্দ্রিয়োপাত্ত (Sense Datum)। শব্দ, গন্ধ, রস, বর্ণ, স্বাদ ইত্যাদি সরাসরি সংবেদনের মাধ্যমে আমরা পাই, কাজেই এগুলোকেই ইন্দ্রিয়োপাত্ত বলা যেতে পারে। আর এভাবে নব্য বাস্তববাদীগণ বার্কলীর ভাববাদ খণ্ডন করে তার সমাধি রচনা করেন।

নব্য সবিচার বাস্তববাদ (New Critical Realism)

১৯২০ সালে "The essays in critical realism" নামক গ্রন্থের যৌথ রচয়িতা ডুরান্ট ড্রেক, আর্থার লাভ জয়, জেমস প্র্যাট, আর্থারকে বজার্স, জজ সান্টেয়ানা, রয়উড সেলার্স এবং সি.এ ষ্ট্রংক। তাঁরা উক্ত গ্রন্থের ভেতরে ভাববাদ এবং নব্য বাস্তববাদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন নব্য সবিচার বাস্তববাদ। বস্তুর নব্য সবিচার বাস্তবাদ ভাববাদ এবং নব্য বাস্তববাদের মধ্যবর্তী একটি স্থান দখল করে রয়েছে।

সবিচারবাদীরা আত্মগত ভাববাদের সমালোচনা করে বলেন, বস্তুর গঠনমূলক গুণ অর্থাৎ রূপ, বর্ণ, গন্ধ এসব মন নির্ভর নয়। আবার এগুলোকে বস্তুর প্রকৃত গুণ মনে করাও ঠিক নয়। কেননা বাহ্যিক জগত তথা বস্তুকে সরাসরি জানা সম্ভব নয়। প্রকৃত পক্ষে মন নিরপেক্ষ বস্তুকে আমরা উপাত্ত বা ইন্দ্রিয়োপাত্তের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানি। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োপাত্ত (Sense datum)-এর মাধ্যমেই আমরা বিষয় জ্ঞান অর্জনকারী। নব্য সবিচার বাস্তববাদীদের

মতানুসারে জ্ঞানের তিনটি অংশ রয়েছে, (১) প্রত্যক্ষকারী মন (Perceiving mind), (২) বাহ্যবস্তু (External Object) এবং (৩) ইন্দ্রিয়োপাত্ত (Datum of Perception)। এসবের মধ্যে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়োপাত্তকেই সরাসরি জানা যায়। নিম্নে নব্য সবিচার বাস্তববাদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ করতে পারি।

ভাববাদ (Idealism)

ভাববাদ বাস্তবাদের বিপরীতধর্মী একটি দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি তবে তা নতুন কোন মতবাদ নয় বরং অতি প্রাচীন। ভাববাদ শব্দটি বিভিন্ন অর্থ থাকলেও দর্শনে তিনটি অর্থে গ্রহণ করা হয়।

১. ভাববাদ এমন একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের কথা বলে যার অনুসারীগণ মনে করেন বস্তু আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে মনের ধারণা বিশেষ।
২. এটা এমন একটি পরিণতিমূলক মতবাদ যা এই বিশ্বকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে ক্রম অগ্রসর মান মনে করে।
৩. ভাববাদ বলতে এমন একটি পরাতাত্ত্বিক মতবাদকে বোঝায়, যার অনুসারীগণ বিশ্ব জগতকে চিন্তন বা মনের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করে।

অনেকে ভাববাদ শব্দটিকে আদর্শবাদী বলে মনে করেন। কিন্তু শব্দটির দার্শনিক অর্থ আদর্শ (Ideal) নয় বরং ধারণা (Idea)। প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক প্লেটো ভাববাদের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন। তাঁর মতে, যথার্থ জ্ঞান সার্বিক বা সাধারণ ধারণা, বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রকৃত কোন সত্তা নেই, কেবল সার্বিকেরই (Universal) অস্তিত্ব আছে। প্লেটো এই সার্বিকেরই নাম দিয়েছেন ধারণা (Ideas)। আধুনিককালে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ভাববাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে জজ বার্কলীর আত্মগত ভাববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। অন্যান্য ভাববাদীরা হচ্ছেন জার্মানের দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট, জে. জি. ফিখটে, শেলিং ও জজ উইলহেলম হেগেল। অন্যদিকে ব্রিটেনের ব্রাডলী ও ইটালীতে বিনিডেটো ক্রুসি প্রমুখ। তবে ভাববাদী দার্শনিকগণের মধ্যে কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্য ও গরমিলও লক্ষ্য করা যায়। তাই এটি একটি জটিল মতবাদ। জ্ঞানতাত্ত্বিক ও পরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাববাদকে আমরা নিম্নরূপে ভাগ করতে পারি।

- জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে: ক. বার্কলীর আত্মগত ভাববাদ ও খ. কান্টের অবভাসিক ভাববাদ।
- পরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে: ক. লাইবনিজের অধ্যাত্মবাদী ভাববাদ ও খ. হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ বা পরবক্ষ্মবাদ।

ভাববাদীগণ তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুক্তি দেন বা এই মতবাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে তুলে ধরা হলো–

১. ভাববাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক একটি মতবাদ হিসেবে জ্ঞেয়বস্তুর মন নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই মতবাদের মূলকথা হলো বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব মন নির্ভর। অর্থাৎ মন অতিরিক্ত কোন সত্তা বস্তুর নেই। এক্ষেত্রে ভাববাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক বাস্তববাদের বিরোধী একটি মতবাদ।
২. পরাতাত্ত্বিক মতবাদ হিসেবে ভাববাদ এমন একটি মতবাদ যা চরম সত্তাকে আধ্যাত্মিক হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকে। সেদিক থেকে ভাববাদ সব রকমের জড়বাদ বিরোধী একটি মতবাদ।
৩. ভাববাদীদের মতে, বিশেষ করে বার্কলীর মতে, গুণাতিরিক্ত কোন অজ্ঞাত বা অজানা বস্তুর অস্তিত্ব নেই। এসব গুণাবলি ব্যক্তি মনেরই ধারণা। সুতরাং মন নিরপেক্ষ বস্তু থাকতে পারে না।
৪. ভাববাদীদের মুক্তি হলো সব কিছুকে সন্দেহ করা গেলেও যে মন সন্দেহ করছে তাকে সন্দেহ করা যায় না। অর্থাৎ মনের অস্তিত্ব সন্দেহহাতীত। কাজেই বাহ্য বস্তুমন নির্ভর।

৫. ভাবাবাদীদের মতে বাইরের সব বস্তুই মনের ধারণা। যেমন, আমরা দড়িকে অনেক সময় সাপ মনে করে থাকি আবার অন্ধকারে কার্ডকে দেখে ভুত মনে করি ইত্যাদি। এ থেকে বোঝা যায় বাহ্যবস্তু বলে আমরা ভুল করি তাহলো আসলে বস্তু কিছু নেই সবই আমাদের মনের ধারণা।

উপরের যুক্তিগুলোর মাধ্যমে ভাববাদীগণ তাঁদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাস্তববাদের সাথে ভাববাদের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তাদের তুলনামূলক আলোচনার এ পার্থক্য আরো সুস্পষ্টরূপে নির্ণয় করতে আমরা সক্ষম হব।

বাস্তববাদ ও ভাববাদের পার্থক্য

জ্ঞানভিত্তিক মতবাদ হিসেবে বাস্তববাদ ও ভাববাদ দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ। কেননা বাস্তববাদ বস্তুর স্বাধীন সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং তারা বস্তুর মন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাহ্যবস্তুকে আমরা সরাসরি জানতে পারি। পক্ষান্তরে, ভাববাদ অনুযায়ী বাহ্যবস্তু মন নির্ভর। মন বহির্ভূত কোন সত্তার অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেন না। যেমন– টেবিলের যে ধারণা তা টেবিলকে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেও মনের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ প্রকৃত সত্তা টেবিল নয় টেবিলের ধারণা (Idea)।

১. বাস্তববাদীরা বস্তুর গুণাবলি বিচার বিশ্লেষণ করে গুণের আধাররূপেই বস্তুকে স্বীকার করে নেন। পক্ষান্তরে, ভাববাদীদের মতে বস্তুর গুণাবলি ব্যক্তি মনের ধারণা ছাড়া কিছুই নয়।
২. বাস্তববাদীরা মনে করেন মূখ্যগুণ ও গৌণগুণ মিলেই বস্তু। বস্তুর মূখ্যগুণগুলো বস্তুগত, আর গৌণগুণগুলো ব্যক্তিগত। পক্ষান্তরে, ভাববাদীরা মনে করেন বস্তুর সব ধরনের গুণই ব্যক্তি মন নির্ভর। পরিশেষে আমরা এক কথাই বলতে পারি যে, ভাববাদ ও বাস্তববাদ এ দুইটি সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ ও পরস্পর বিরোধী মতবাদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সক্রেটিস, প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল কোন ধরনের দার্শনিক?
   ক. বুদ্ধিবাদী
   খ. অভিজ্ঞতাবাদী
   গ. স্বজ্ঞাবাদী
   ঘ. বাস্তববাদী

২. দেকার্ত ধারণাকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করেন?
   ক. পাঁচটি
   খ. দুইটি
   গ. তিনটি
   ঘ. চার

৩. "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি অস্তিত্বশীল"– উক্তিটি কার?
   ক. কান্টের
   খ. প্লেটোর
   গ. দেকার্তের
   ঘ. হিউমের

৪. বাস্তববাদীদের মতে জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে–
   ক. মন নিরপেক্ষ
   খ. মন নির্ভর
   গ. স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বশীল
   ঘ. কোনটি নয়

৫. ভাদবাদীকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
   ক. চারটি
   খ. তিনটি
   গ. পাঁচটি
   ঘ. দুইটি

৬. ভাববাদ অনুসারে জ্ঞানের বিষয় সব সময়–
   ক. মন-নিরপেক্ষ
   খ. মন-নির্ভর
   গ. ব্যক্তি নির্ভর
   ঘ. বস্তু নির্ভর

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. গ ৪. ক, ৫. ক, ৬. খ

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. বুদ্ধিবাদের মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করুন।
২. অভিজ্ঞতাবাদ বলতে কী বুঝায়?
৩. স্বজ্ঞাবাদ কী?
৪. বাস্তববাদের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বুদ্ধিবাদী দার্শনিক কারা? বুদ্ধিবাদের মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করুন।
২. অভিজ্ঞতাবাদ বলতে কী বুঝায়? মতবাদটি ব্যাখ্যা করুন।
৩. স্বজ্ঞাবাদ কী? এটা কী জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসেবে সন্তোষজনক? মন্তব্য করুন।
৪. বিচারবাদের প্রধান প্রবক্তা কে? বিচারবাদ জ্ঞান উৎপত্তির ক্ষেত্রে কতটা সফল মতবাদ ব্যাখ্যা করুন।
৫. বাস্তববাদের মূল বক্তব্য কী? ব্যাখ্যা করুন।
৬. বাস্তবাদের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন। জ্ঞান উৎপত্তিতে সরল বাস্তববাদ ও বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ ব্যাখ্যা করুন।
৭. নব্য বাস্তববাদ ও নব্য সবিচার বাস্তববাদ এর পার্থক্য তুলে ধরুন।
৮. ভাববাদ অনুসারে কীভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়? বাস্তববাদ ও ভাববাদের পার্থক্য তুলে ধরুন।

পাঠ- ১.৫: সত্যতার স্বরূপ ও মানদণ্ড

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সত্যতা বনাম বিশ্বাস কী তা বলতে পারবেন।
- সত্যতা বনাম বৈধতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সত্যতার মানদণ্ডগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সত্যতার মানদণ্ড হিসেবে অনুরূপতাবাদ, সঙ্গতিবাদ স্বত: প্রতাতিবাদ ও প্রয়োগবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জ্ঞানের প্রকৃতি

জ্ঞানের প্রকৃতি, স্বরূপ ও বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি এবং তা থেকে দৈনন্দিন জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্পর্কে ধারণাও পেয়েছি। শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আপনারা জীবনের কথাবার্তা ও কাজের মাঝে সত্য ও মিথ্যা শব্দ দু'টির সাথে খুবই পরিচিত। এই পাঠে সত্যতা কী সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে জানতে হবে সত্যতার বিষয়টি জ্ঞানের স্বরূপ ও তাৎপর্য অনুসন্ধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বলা যায়, এটা জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার অনিবার্য একটি শর্ত। কেননা, আমরা যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি না কেন সেই বিষয়টি অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়ে সত্যতা আছে কিনা তা নিশ্চিত না হলে বিষয়টি জ্ঞান পদবাচ্য রূপে বিবেচিত হতে পারে না। পূর্বের পাঠ থেকে আমরা জ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে, কোন বিষয়কে জ্ঞান পদবাচ্য হতে হলে তার মধ্যে অন্তত তিনটি পূর্বশর্ত থাকা আবশ্যক, যেমন– (১) যে বিষয়ের জ্ঞান হবে সেই বিষয়কে অবশ্যই সত্য হতে হবে; (২) বিষয়টি শুধু সত্য হলেই চলবে না, তাকে সত্য বলে বিশ্বাসও করতে হবে এবং (৩) সেই বিষয়ের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ যুক্তিও থাকতে হবে। আর যে বিষয়গুলো এ তিনটি শর্ত পূরণে সক্ষম হবে কেবল সেই বিষয়টিই জ্ঞানের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে। তাই নয়, এই তিনটি শর্ত পূরণে অক্ষম হলে সে বিষয়টির কোন জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, জ্ঞানের স্বরূপের সাথে তার সত্যতার বিষয়টিও অতোপ্রতোভাবে জড়িত। এ কারণেই বলা হয় সত্যতা সম্পর্কীয় সমস্যা জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology)-র একটি অতি পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

সত্যতা বনাম বিশ্বাস

পূর্বের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, তিনটি শর্ত পূরণ করলেই কেবল কোন বিষয়কে জ্ঞানরূপে তখনই স্বীকার করা যাবে যখন বিষয়টি সত্য বলে বিশ্বাস করা যায় এবং বিশ্বাসের অনুকূলে পর্যাপ্ত যুক্তি ও বিদ্যমান থাকবে। এ কথার অর্থ হলো সত্যতার সাথে বিশ্বাসের একটা অনিবার্য যোগসূত্র ও সম্পর্ক রয়েছে। আবার সত্যতার সাথে বিশ্বাসের পার্থক্যও রয়েছে। কেননা কোন বিষয় বিশ্বাস করলেই তা যেমন সত্য হবে বলা যায় না, তেমনি কোন বিষয়ে বিশ্বাস নেই বলে তা সত্য হতে পারে না– একথাও নিশ্চিত বলা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বিশ্বাস কেবল তখনই সত্য বলে বিবেচিত হবে, যখন বাস্তব অবস্থা বা বাস্তব ব্যাপার (Fact)-এর সাথে তার মিল বা সঙ্গতি থাকবে। আর সত্যতা ও বিশ্বাসের মধ্যে এ সম্পর্কই বিদ্যমান।

১. হসপার্সের মতে, কোন বিশ্বাস বা বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্বের সাথে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নামক ক্রিয়ার কোন সম্পর্ক নেই। পর্যাপ্ত যুক্তি বা প্রমাণের সাথে রয়েছে বিশ্বাসের সম্পর্ক। যখন কোন বিষয়ের পক্ষে পর্যাপ্ত যুক্তি

প্রমাণ থাকে তখন তাকে অবিশ্বাস করার কোনই কারণ নেই। কাজেই বিশ্বাস শুন্যগর্ভ কোন মানসিক অবস্থা নয়, বরং এটি হচ্ছে যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিক একটি মানসিক অবস্থা।

২. অনেক সময় বলা হয় যে, "আমি যতদূর জানি ব্যাপারটি সত্য" (Well at least as for as I'm concerned, it's true)-এ জাতীয় কথা না বলাই বাঞ্ছনীয় বলে হসপার্স মনে করেন। কেননা তাতে সত্যতা ও বিশ্বাস নিয়ে আরো বিভ্রান্তি তৈরি হয়। তাই সেক্ষেত্রে বাক্যটি এভাবে বলা যেতে পারে, "আমি যতদূর জেনেছি তাতে ব্যাপারটি সত্য বলেই আমি বিশ্বাস করি।" তাহলে সত্যতা ও বিশ্বাস মধ্যে গুলিয়ে ফেলা হয় না।

৩. দৈনন্দিন জীবনে আমরা কখনো কখনো এটাও বলি যে, "আমার কাছে ব্যাপারটি সত্য, তোমার কাছে এটি সত্য নাও হতে পারে" (To me it's true, to you it may not be)। হসপার্সের মতে এ ধরনের কথা সত্যতা নামক বিষয়টিকে আপেক্ষিকতার পর্যায়ে ফেলে দেয়, যা বিভ্রান্তিকর। আর এভাবে সত্যতার সাথে বিশ্বাসকে গুলিয়ে না ফেলাই উচিত। মনে রাখতে হবে সত্যতা কোন আপেক্ষিক বিষয় নয়, এটি সব সময় শ্বাশত বিষয়। পক্ষান্তরে, বিশ্বাস হচ্ছে একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। সত্যতা ও বিশ্বাসের সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণার অভাবেই এমনটি ঘটে। মোট কথা সত্যতা ও বিশ্বাসের যে পার্থক্য তা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হতে হবে তবেই আমরা সঠিক জ্ঞান পেতে পারবো।

সত্যতা ও বৈধতা

সত্যতার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে হলে সত্যতার সাথে বৈধতা (Validity)-এর সম্পর্ক নিয়েও আমাদের আলোচনা করা দরকার। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, সত্যতা সবসময় বচন, বাক্য বা উক্তির সাথে সম্পর্কিত। আর বৈধতা সব সময় অনুমান বা যুক্তির সাথে সম্পর্কিত। সে ক্ষেত্রে বৈধতার নীতিমালা দ্বারা তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা যখন কোন যখন কোন বাক্যকে সত্য বলে দাবী করি তখন তা দ্বারা এটাই বুঝছি যে, বক্তব্যটি বাস্তবের অনুরূপ। যেমন– "মানুষ মরণশীল"– এ বচনটি সত্য বলেই বিধৃত হয়। যেহেতু তা বাস্তবের অনুরূপ বা সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু "সকল কাম সাদা" একথা বললে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয় কারণ তা বাস্তবের অনুরূপ নয়, বা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সত্যতা ও বৈধতার প্রকৃতি থেকে সেটাই প্রতীয়মান হয়ে যে, কোন যুক্তির বৈধতা বচন বা বাক্যের সত্যতার উপর নির্ভর করে না, তা যুক্তির নিয়মানুযায়ী হয়েছে কিনা সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আর সত্যতার ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে, বচন বা বাক্যটি বা কোন বক্তব্য বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলো কিনা তা লক্ষ্য করা। আর তাই সত্য উক্তি বা বচন দ্বারা গঠিত যুক্তিও অবৈধ হতে পারে যদি তা নিয়মানুযায়ী না হয়। একইভাবে মিথ্যা বচন দ্বারা তৈরি যুক্তিও বৈধ হবে যদি তা নিয়মানুযায়ী গঠিত হয়। সুতরাং বচন বা বাক্যের সত্যতা, মিথ্যাত্ব যুক্তির বৈধতা বা অবৈধতাকে প্রভাবিত করতে পারে না।

সত্যতার স্বরূপ ও মানদণ্ড

দর্শনের ইতিহাসে সত্যতা সম্পর্কীয় সমস্যাটিকে দু'টি দিক থেকে বিবেচনা করা হয়। প্রথমটি হলো সত্যতার স্বরূপ (The nature of truth) এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সত্যতার মানদণ্ড (The criterion of truth)। প্রথমটি সত্যতার প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন, দ্বিতীয়টি সত্যতার পরীক্ষা এ ভিন্ন দুটি বিষয়কে অভিন্ন করে দেখা ঠিক নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল এ পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, সত্যতার প্রকৃতি সত্যতার জ্ঞানের সাথে জড়িত নয়, কিন্তু সত্যতা নিরূপণের মানদণ্ড তার জ্ঞানের সাথে জড়িত আর এ দু'টি সমস্যার পারস্পরিক পার্থক্যকে মনে রেখেই দর্শনের ইতিহাসে সত্যতার স্বরূপ ও মানদণ্ড নিয়ে প্রধানত চারটি ভিন্ন মত গড়ে ওঠেছে। যেমন– স্বত:প্রতীতিবাদ, ২. সঙ্গতিবাদ, ৩. অনুরূপতাবাদ ও ৪. প্রয়োগবাদ।

স্বত:প্রতীতিবাদ (Self Evidence Theory): দেকার্ত, লক, স্পিনোজা ও লাস্কি এ মতবাদের অন্যতম প্রধান অনুসারী। তাঁরা সকলেই একমত যে, স্বত:প্রতীতি বা নি:সন্দিগ্ধতাই বচনের সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড। তাই স্বত:প্রতীতিবাদ অনুসারে কোন বচন যদি সত্যি হয়, তাহলে তা স্বত:স্ফুর্তভাবে বা আপনা আপনিই সত্য বলে আমাদের কাছে ধরা পড়ে। এজন্য অন্য কোন কিছুর ওপর নির্ভর করতে হয় না। যেমন– যৌক্তিক চিন্তার মূল সূত্রসমূহ, বিশুদ্ধ গণিত শাস্ত্র, নৈতিক বিধানসমূহ ইত্যাদি প্রমাণের জন্য অন্য কোন বচন বা শক্তির উপর নির্ভর করতে হয় না। দেকার্তের বিখ্যাত উক্তি "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি"। এটাকে দার্শনিক স্পিনোপা, লক ও লাস্কিও সমর্থন দেন। তারা সকলেই মনে করেন "আত্মজ্ঞান সর্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত সত্য বলে মনে হয়"। এটা সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। আর এ ধরনের নিশ্চয়াতামুক্ত ও নি:সন্দিগ্ধ জ্ঞানকেই সত্য বলা যায়। তাই স্বত:বোধ্যতা বা স্বত:প্রতীতিই সত্যতার স্বরূপ ও সত্য নির্ণয়ের মানদণ্ড।

সঙ্গতিবাদ (Coherence Theory)

সত্যতার স্বরূপ ও সত্যতা নিরূপণের মানদণ্ড হিসেবে একত্ববাদী ভাববাদী দার্শনিকগণ যে মতবাদের অবতারণা করেন দর্শনের ইতিহাসে সেটাই সঙ্গতি নামে পরিচিত। তম্মধ্যে হেগেল, ব্রাডলী, বোসাঙ্কে, কায়েট প্রমুখ ভাববাদীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার যৌক্তিক দৃষ্টবাদী ও বাস্তববাদী দার্শনিকের অনেকেই এ মতের অনুসারী। যেমন– অটো নিউরথ, কার্ল হেলপেলি, রাওলফ, কার্নাপ প্রমুখ। এ মতবাদ অনুসারে অনেকগুলো বচনের মধ্যে যদি পারস্পরিক একটা সম্পর্কেও সংগতি থাকে তাহলে তা সত্য বলে গণ্য করা যায়। তাই কোন বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করতে হলে গৃহীত বচন মণ্ডনীর সাথে বচনটির আদৌ কোন সংগতি আছে কিনা তা দেখা দরকার। বচনের সত্যতা পরীক্ষা করার অর্থই হচ্ছে তার সঙ্গতি পরীক্ষা করা।

এখানে 'সঙ্গতি' বলতে বোঝায় এমন একটি সম্পর্ক যার ফলে একটি বচনের সাথে আরেকটি বচনের সঙ্গতি থাকে এবং যৌক্তিকভাবে একই সাথে এদের বিকৃত (Asserted) করা যায়। কেননা একটি বচনের সত্যতা ঐ বচনের সাথে পূর্ব প্রমাণিত অন্যান্য সব বচনের সঙ্গতির উপর নির্ভর করে। যেমন– বিশুদ্ধ গণিত, জ্যামিতি ও আকারগত যুক্তিবিদ্যায় এ সঙ্গতিকেই সত্যতা নিরূপণের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ব্রাডলী ও বোসাঙ্কের মতানুসারে সমগ্রের সাথে সঙ্গতি হচ্ছে সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড এবং অসঙ্গতি বা বিরোধ মিথ্যাত্ব নিরূপণের মানদণ্ড।

অনুরূপতাবাদ (Correspondence Theory)

প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল অনুরূপতাবাদের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁর মতে, বাস্তবাবস্থা (Fact)-এর সাথে যদি বচনের অনুরূপতা থাকে তাহলে সেই বচনকে সত্য বলা যাবে, আর যদি কোন বচনের বাস্তব অবস্থার সাথে অনুরূপতা না থাকে তাহলে বচনটিকে মিথ্যা বলতে হবে। অনুরূপতাবাদীগণ অনুরূপতাকেই সত্যতার স্বরূপ ও মানদণ্ড বলে মনে করেন। উদাহরণস্বরূপ দু'টি বচনের উল্লেখ করা যায়। যেমন– আমরা যদি বলি "মানুষ অমর" ও বচনটি বাস্তবাবস্থার অনুরূপ নয়। কেননা বচনটিতে যে বক্তব্য রয়েছে তা আমরা বাস্তবে পাই না। কাজেই বচনটি মিথ্যা। কিন্তু যখন বলি "মানুষ দ্বিপদ প্রাণী" তখন বাস্তবাস্থার অনুরূপ বলেই তা সত্য। বচনটি যা বিধৃত করে তা বাস্তবের অনুরূপ। এভাবে অনুরূপতাবাদীরা সত্যতার স্বরূপ এবং সত্যতা নিরূপণের মানদণ্ড হিসেবে অনুরূপতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন।

অনুরূপতাবাদ সম্পর্কে এতক্ষণ আমরা যেটুকু আলোচনা করেছি তাতে এই মতবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ মতবাদের যে মূল বক্তব্য হলো দু'টি। যেমন–

১. সত্যতা হলো এক ধরনের বিশ্বাস যা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট বাস্তব অবস্থার সম্বন্ধের ওপর এবং
২. এই সম্বন্ধ হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের সম্বন্ধ, যাকে আমরা অনুরূপতা শব্দের দ্বারা প্রকাশ করে থাকি।

অনুরূপতা সম্বন্ধের বিষয় হচ্ছে দু'টি– একটি হলো বিবৃতি বা বিশ্বাস, অপরটি হলো বাস্তবাবস্থা (Fact)। এখানে বিশ্বাস ও বিবৃতি বলতে কোন ক্রিয়াকে বোঝায় না বরং বিশ্বাসের বিষয়কে বোঝায়। আর সেটি হলো বচন। বচনই হলো অনুরূপতা সম্বন্ধের প্রথম বিষয়। বাস্তবাবস্থাও অনুরূপতা সম্বন্ধের আরেকটি বিষয়। অবশ্য বাস্তবাবস্থা বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে অনুরূপতাবাদীদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। তবে বাস্তব অবস্থা শব্দটিকে ঘটনা শব্দটির সাথে দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেভাবে গুলিয়ে ফেলি তা থেকেই সমস্যাটি তৈরি হয়। এ জন্য বাস্তবাস্থার সাথে ঘটনার পার্থক্যকে বুঝতে হবে এবং মনে রাখতে হবে এ দুটি এক বিষয় নয়। নিচে ঘটনা ও বাস্তবাবস্থার পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

১. ঘটনা সবসময়ই কাল সাপেক্ষ। ঘটনা মানেই তা একটি স্থানে ও কালে ঘটে। তাই ঘটনার জন্য স্থান, কাল ও ব্যাপ্তি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাস্তবাবস্থার জন্য এ তিনটির কোনটিই লাগে না তা সব সময় বর্তমান কালের ক্রিয়ায় আমরা প্রকাশ করি।
২. ঘটনা মানেই তা কোন একক বা বিচ্ছিন্ন বিষয় সাপেক্ষ। কিন্তু বাস্তব অবস্থা দ্বারা আমরা কোন একক ব্যাপারকে নির্দেশ করি না তাই এটা তার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যও নয়।
৩. বাস্তবাস্থার মাঝে একটি সার্বিক ও অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে, যা ঘটনার বেলায় প্রযোজ্য নয়। আর এখানেই ঘটনা (Event) ও বাস্তবাবস্থা (Fact)-এর বিরাট পার্থক্য।

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটি আসে তাহলো অনুরূপতা বলতে আসলে কী বোঝায়? এখন আমরা অনুরূপতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করব–

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্কার হবে।

যেমন– "মধু মিষ্টি"– এ বাক্যটি সত্য কেননা ঘটনার সাথে বাক্যটির অনুরূপতা আছে এবং প্রকৃত পক্ষে মধু মিষ্টি। কিন্তু যদি বলা হয় "দুধ কালো" এ বাক্যটি মিথ্যা কেননা বাস্তবাস্থার সাথে এর অনুরূপতা নেই। এ ধরনের বচন ধারণা বা ধারণা পরিমণ্ডল (A System of Ideas) সাথে এক জাতীয় সত্তা বা সত্তা পরিমণ্ডল-এর (A System Jeality) এমন একটি অনুরূপতা আছে যে তার প্রতি আমাদের বিশ্বাসও রয়েছে। যা অবিশ্লেষণীয়।

প্রয়োগবাদ (Pragmatic Theory)

প্রয়োগবাদ অনুসারে সত্যতার স্বরূপ ও সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হচ্ছে কোন বিষয়ের প্রয়োজন বা উপযোগিতা (Ulility)। তাই এ মতবাদকে প্রয়োজনবাদও বলা হয়। এ মতবাদের অনুসারী হলেন মার্কিন দার্শনিক মি. এস পার্স, ইউলিয়াম এবং এফ.সি. এস শীলার বিট্রিশ দার্শনিক প্রমুখ। তারা সকলেই মনে করেন বচনের ফলপ্রসূতা, উপযোগিতা, সন্তোষজনক ফলাফল, ব্যবহারিক মূল্য বা কার্যকারিতা ইত্যাদি হচ্ছে সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড। সংক্ষেপে বলা যায়, যে ধারণা বা বচনের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বা মূল্য রয়েছে তা সত্য এবং যার ব্যবহারিক মূল্য নেই তা প্রয়োজনীতা নেই তা মিথ্যা। প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য না থাকলেও কিছু কিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তাই নিচে পৃথক পৃথকভাবে তাঁদের বক্তব্য আলোচনা করা হলো।

পার্সের অভিমত: দার্শনিক পার্স ব্যবহারিক ফলাফলের উপরে খুব বেশি গুরুত্বারোপ করেন। তাই তাঁর মতে, বচনের সত্যতা নির্ভর করে তার ব্যবহারিক ফলাফলের উপর। যে বচনের ব্যবহারিক সফলতা বা মূল্য রয়েছে সেই বচনই সত্য; যে বচন ব্যবহারিক প্রয়োজন পূরণে ব্যার্থ তা মিথ্যা।

জেমসের অভিমত: জেমস একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। কাজেই জ্ঞান অর্জন ও সত্যতা নির্ণয় উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অভিজ্ঞতার উপরেই গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, সত্যতা বচনের কোন অভ্যন্তরীণ গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয় বরং এটা তার অনাকাঙ্ক্ষিক বা আপেক্ষিক গুণ যা নির্ভর করে তার সুবিধাদির ওপরে। অর্থাৎ কোন বচন বা বিষয় একটি

প্রক্রিয়া যা আস্তে আস্তে সত্যতায় পর্যবসিত হয় এর কার্যকারিতা ফলাফলের মাধ্যমে। যেমন, কোন বচন বা চিন্তা যদি বাস্তব জীবনে আমার কাজে লাগে বা হিতকর মনে হয় তাহলে সেটা সত্য প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার পরশ পাথরে তাকে যাচাই করতে হবে। সত্যতার মানদণ্ড হচ্ছে কার্যকারিতা, উপযোগিতা ও হিতকারিতা। কাজেই শ্বাশত বা চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই, সত্যতা আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল বিষয়।

ডিউই এর মতামত: জন ডিউইও জেমনের ন্যায় সত্যতাকে বচনের অন্তর্গত কোন গুণ মনে করেন না বরং অর্জিত গুণ বলে মনে করেন। তাঁর ভাষায় সত্যতা দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতার এক বচনের অনুসন্ধানের ফলশ্রুতিতে যে অনুসন্ধান সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত। সুনিয়ন্ত্রিত একটা অনুসন্ধানের ফলে সাফল্যের ওপর সত্যতা নির্ভর করছে। কোন ধারণা, বিশ্বাস, প্রকল্প বা মতামত তখনই সত্য হবে যদি তা ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়। কেবল তখনই তা সত্যতা অর্জনে সক্ষম হয়। অর্থাৎ অনুসন্ধানের ফলে যদি কোন বচন বা বিষয় তুষ্ট করতে পারে তবে তা সত্য হবে নতুবা তা মিথ্যায় পর্যয়সিত হবে।

শীলারের মতামত: শীলারও বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ফলাফলের আলোকে সত্যতা নির্ণয়ের কথা বলেন। তবে তিনি ধারণা, বচন বা বাক্যকে মূল্যায়ন করার ওপরে গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, বিশেষ কোন সাধনের মাধ্যমে কোন বচনের বা বিষয়ের যে প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয় তা হচ্ছে বচনের মূল্যায়ন। আর এ মূল্যায়নই প্রমাণ করে সত্যতার ফলপ্রসূ বা কার্যকারিতাকে। যদি বচন কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় অর্থাৎ প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হয় তখন তা সত্য। আর মিথ্যা হলো সেটা যা কোন প্রয়োজন পূরণ করে না। অর্থাৎ বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধন করার মাধ্যমে বচনটির ব্যবহারিক মূল্যকে মূল্যায়ন করা সম্ভব। আর এ মূল্যায়নই সত্যতা যাচাইয়ের মাপকাঠি বা মানদণ্ড।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সত্যতা বলতে কী বুঝায়?
   ক. বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি বা মিলকে
   খ. বিশ্বাসের সাথে মিলকে
   গ. বিশ্বাসের সাথে গরমিলকে
   ঘ. বাস্তবের অনুরূপকে

২. হসপার্সের মতে সত্যতার সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক কী আছে?
   ক. কোন সম্পর্ক নেই
   খ. সম্পর্ক আছে
   গ. গভীর সম্পর্ক রয়েছে
   ঘ. সীমিত সম্পর্ক আছে

৩. সত্যতার সম্পর্ক কোনটির সাথে?
   ক. যুক্তির সাথে
   খ. বচনের সাথে
   গ. বাক্যের সাথে
   ঘ. কোনটিই নয়

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ক, ৩. খ

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. সত্যতা আসলে কী?
২. সত্যতা ও বৈধতা কী একই বিষয়– ব্যাখ্যা করুন।
৩. অনুরূপতাবাদ বলতে কী বুঝায়?
৪. সত্যতা ও বৈধতার পার্থক্য আলোচনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সত্যতা বলতে কী বুঝায়? সত্যতা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক কী ব্যাখ্যা করুন।
২. সত্যতা ও বৈধতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
৩. সত্যতা সম্পর্কীত মতবাদ হিসাবে প্রয়োগবাদ ব্যাখ্যা করুন।
৪. সত্যতা সম্পর্কে অনুরূপতাবাদ ও সঙ্গতিবাদ ব্যাখ্যা করুন। কোনটি অধিক সন্তোষজনক– আলোচনা করুন।

পাঠ- ১.৬ঃ মূল্যের স্বরূপ ও শ্রেণিবিভাগ
Nature and Classification of Value

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মূল্য কী তা বলতে পারবেন।
- মূল্যের শ্রেণি বিভাগ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার মূল্যের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- মূল্য সম্পর্কিত মতবাদগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মূল্যের স্বরূপ (Nature of Value)

দর্শনের যে শাখাটি বিশেষভাবে মূল্যের স্বরূপ, শ্রেণীকরণ, তাৎপর্য ও বাস্তবাস্থার সাথে এর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলা হয় মূল্যবিদ্যা। আর দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ স্বরূপ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা, যা বিজ্ঞানীরা কখনোই করেন। আর এখানেই বিজ্ঞানের সাথে দর্শনের পার্থক্য। এখন আমরা মূলের স্বরূপ ও তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করব। তবে এ বিষয়ে অন্যান্য বিষয়ের মতই মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। আক্ষরিক অর্থে মূল্য বলতে আমরা সাধারণত যোগ্যতা বা উৎকর্ষতাকে বুঝিয়ে থাকি। সেদিক থেকে যে বস্তুর উপযোগিতা আছে দৈনন্দিন জীবনে আমরা তাকেই মূল্যবোধ বলে মনে করি। এ জন্য আমরা প্রথমেই মূল্য শব্দটির বুৎপত্তিগত দিক থেকে মূল্যের ইংরেজী প্রতিশব্দ Value শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Valco থেকে। বাংলা ভাষায় শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় "ফলপ্রসূ ও উপযুক্ত হওয়া" (Effective and adequate)। আবার ফারসী প্রতিশব্দ Valeur, বাংলা ভাষায় যার অর্থ উৎকর্ষ (Excellence), ইটালী প্রতিশব্দ Valuta-এর বাংলা অর্থ হলো দাম, আর জার্মান প্রতিশব্দ Wert-এর বাংলা অর্থ মূল্য। যা হোক শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহারের কারণেই দার্শনিকদের মধ্যে মূল্য কথাটির তাৎপর্য নিয়ে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করলে মূল্য শব্দটির প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় বস্তু বা ব্যক্তির মূল্য ধারণ বা মূল্য বিচার। সাধারণত আমরা ব্যক্তি বা বস্তুকে দু'ভাবে দেখি। একটি হলো, ব্যক্তি বা বস্তু প্রকৃত অবস্থা কেমন, অন্যটি হলো ব্যক্তি বা বস্তুটি কী ধরনের গুণের অধিকারী। দার্শনিকগণ এই শেষোক্ত দৃষ্টিতেই মূল্য শব্দটি গ্রহণ করেছেন। আর এভাবে ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ বিচার করতে গিয়েই আমরা তার, উপর শুভ, অশুভ, সত্য, মিথ্যা, সন্দুর অসুন্দর, ভালো মন্দ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করি। এ প্রক্রিয়াকেই বলা হয় মূল্যায়ন বা মূল্য নির্ণয়।

মূল্যের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

ভাববাদী দার্শনিকগণ মূল্যকে বস্তুগত বলে মনে করেন। তাদের মতে সত্যতার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক বচনগুলোকে যেমন আমরা বস্তুগত বলে মনে করি, মূল্য ধারণের ক্ষেত্রেও মূল্য বা আর্দশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ বাস্তব উপযোগিতাকেই মূল্য বলে মনে করেন। কেননা, যে বস্তুর ব্যবহারিক মূল্য আছে তাকেই আমরা মূল্যবোধ বলি। অন্যদিকে যৌক্তিক দৃষ্টবাদীগণ মনে করেন, মূল্য বক্তার আবেগকে প্রকাশ করে।

মোট কথা সকল দার্শনিক মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মূল্যকে দু'দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন, (১) আত্মগত মত এবং (২) বস্তুগত মত। মূল্যকে যারা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত বা বিষয়ীগত বলে মনে

করেন সেটাকেই বলা হয় আত্মগত মত (Subjective view of value)। অন্যদিকে যারা মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত বা বিষয় গত অর্থাৎ বস্তু সাপেক্ষ বলে মনে করে তাকে বলে মূল্যের বস্তুগত মত (Objective view of value)। নিরপেক্ষ বিচারে বলতে হয় যে, মূল্য আসলে বস্তুগত ও বিষয়ীগত উভয়ই। যেমন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলো ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির হলেও তার নিজস্ব একটা মূল্যও আছে যা আমাদের সবাইকেই পরিতৃপ্ত করে। কাজেই মূল্য আত্মগত ও বস্তুগত দুই-ই।

মূল্যের শ্রেণিবিন্যাস

মূল্যকে বিভিন্ন নীতির আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এর বিভিন্ন শ্রেণিও রয়েছে। প্রধান প্রধান শ্রেণিগুলো নিচে তুলে ধরা হলো।

১. নৈতিক ও অনৈতিক মূল্য
২. দৈহিক ও মানসিক মূল্য
৩. উচ্চতম ও নিম্নতম মূল্য
৪. স্বত:মূল্য ও পরত:মূল্য ও
৫. আপেক্ষিক ও চরম মূল্য

নিচে সংক্ষেপে মূল্যের বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো–

১. **নৈতিক ও অনৈতিক মূল্য:** দৈনন্দিন জীবনে আমরা মূল্য শব্দটিকে ভাল মন্দ, নৈতিক অনৈতিকসহ আরো অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করি। নৈতিক মূল্যকে অন্যান্য মূল্যের সাথে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। নৈতিকমূল্যকে বুঝতে হলে অনৈতিকমূল্যকে বুঝতে হবে। অর্থনীতিকে যে মূল্যের বলা হয় হয় তা অর্থনৈতিক মূল্য। টাকা-পয়সার বিনিময়ে আমরা পণ্য ক্রয় বিক্রিয় করি এটাকে বলা হয় বিনিময় মূল্য। সুন্দর ছবি, গান, নৃত্য, কবিতা-নাটক প্রভৃতির রয়েছে নান্দনিক মূল্য। আবার মন্দির, গীর্জা, মসজিদ এ সবের রয়েছে ধর্মীয় মূল্য। উল্লেখ্য এসব মূল্যের নৈতিক কোন মূল্য নেই, এদের রয়েছে নীতি নিরপেক্ষ মূল্য। আর এসব মূল্যকেই বলা হয় অনৈতিক মূল্য। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে নৈতিক মূল্য বলতে তা হলে কী বুঝায়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, যে সকল কাজ মানুষ স্বত:স্ফুর্তভাবে স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে করে থাকে, যে কাজে তার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে যে সে কোন কাজটি করবে এবং যে কাজের ওপরে আমরা ভাল-মন্দ বা উচিত অনুচিত শব্দগুলো প্রয়োগ করতে পারি তাকেই বলে নৈতিক কর্ম। আর নৈতিক কর্মের কেবল নৈতিক মূল্য রয়েছে। নৈতিক কাজ কখনোই আকস্মিকভাবে বা কোন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ করে না। বরং কোন না কোন নীতিই কাজের চালিকা শক্তিরূপে কাজ করে। আর সেদিক থেকে কেবলমাত্র স্বেচ্ছা প্রণোদিত কর্মই নৈতিক মূল্যের অধিকারী।
২. **দৈহিক ও মানসিক মূল্য:** মানুষ দেহ ও মন নামক দু'টির মিলিত প্রকাশ। দৈহিক মূল্য বলতে দেহের মূল্যকে বুঝায়। যেমন– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্বাস্থ্য, সম্পদ, কর্মদক্ষতা ও যৌন কামনা-বাসনা ইত্যাদি। অভাবের সাথে মানুষের দৈহিক মূল্য জড়িত। পক্ষান্তরে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা নামক মানব মনের তিনটি বৃত্তির সাথে জড়িত থাকে মানুষের মানসিক মূল্য। এই তিনটি বৃত্তি থেকেই আসে সত্য, সন্দুর ও মঙ্গলের আদর্শ। চিন্তা থেকে আসে সত্য, অনুভূতি থেকে আসে সুন্দর এবং ইচ্ছা থেকে আসে মঙ্গল।
৩. **উচ্চতম ও নিম্নতম মূল্য:** উৎকর্ষের তারতম্যের ভিত্তিতে মূল্যকে দুটিভাগে ভাগ করা হয়। তাহলো উচ্চতম ও নিম্নতম মূল্য। মানসিক যে মূল্যগুলোর কথা বলা হয় তার ভিত্তিতে আবার অধ্যাত্মিকতার প্রভাবেও কিছু মূল্য গড়ে ওঠে। এগুলোকে বলা হয় উচ্চতম মূল্য। কেননা মানব জীবনে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, দৈহিক মূল্যকে বলা হয় নিম্নতম মূল্য। এগুলো ভূমিকা জীবনে গৌণ।

৪. **স্বত:মূল্য ও পরত:মূল্য:** ব্যক্তি বা বস্তুর নিজস্ব কোন মূল্য আছে কীনা এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মূল্যকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- (১) স্বত:মূল্য ও (২) পরত:মূল্য। যে বস্তুর নিজস্ব মূল্য রয়েছে সেই বস্তুর মূল্যকে বলা হয় স্বত:মূল্য। যেমন– সত্য, সুন্দর, মঙ্গল এ আদর্শগুলোর নিজস্ব মূল্য রয়েছে। কিন্তু যে বস্তুর নিজস্ব মূল্য নেই, বরং অপর বস্তুকে মূল্যবান করতে সহায়তা করে সেই বস্তুর মূল্যকে বলা হয় পরত:মূল্য। যেমন– টাকা-পয়সা। এগুলোর নিজস্ব কোন মূল্য নেই তবে বিনিময় মূল্যের কাজে সহায়ক ভূমিকা রাখে বলে এদের মূল্যকে পরত:মূল্য বলে।

৫. **আপেক্ষিক ও চরম মূল্য:** উপযোগিতার দিক থেকে মূল্যকে আপেক্ষিক মূল্য ও চরম মূল্য এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। সত্য, সুন্দুর, মঙ্গল এগুলো জীবনের আদর্শ হিসেবে কাজ করে তাই এদেরকে পরম মূল্য বা চরম মূল্য বলা হয়। তাছাড়া এদের নিজস্ব মূল্যও রয়েছে। তাই এদেরকে স্বত:মূল্যও বলা হয়। কিন্তু যেসব মূল্যকে মানুষ জীবনের আদর্শ বা লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করে না তাদের বলা হয় আপেক্ষিক মূল। দৈহিক ও অর্থনৈতিক মূল্যগুলো আপেক্ষিক মূল্যের আওতাভুক্ত। কেননা আমার কাছে যা মূল্যবান তা আরেক জনের কাছে মূল্যবান নাও হতে পারে। তাই এ ধরনের মূল্যকে আত্মগত মূল্যও বলা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মূল্য শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী?
   ক. বস্তু বা ব্যক্তির মূল্য বিচার
   খ. ভাল বা মন্দের পরিমাপক
   গ. ভালোর পরিমাপক
   ঘ. কোনটিই নয়

২. উপযোগিতার ভিত্তিতে মূল্যকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
   ক. দুইটি
   খ. তিনটি
   গ. চারটি
   ঘ. পাঁচটি

৩. মূল্যকে যারা ব্যক্তিগত বা বিষয়ীগত মনে করেন তাকে কী বলে?
   ক. আত্মগত মত
   খ. পরাগত মত
   গ. নিরপেক্ষ মত
   ঘ. সাপেক্ষ মত

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ক, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. মূল্য কত প্রকার ও কী কী?
২. নৈতিক মূল্য বলতে কী বুঝায়?
৩. চরম মূল্য বলতে কী বুঝায়?
৪. নৈতিকমূল্য, অনৈতিক মূল্য ও নৈতিক মূল্য কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মূল্য বলতে কী বুঝায়? মূল্যের শ্রেণি বিভাগ করুন।
২. মূল্য কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করুন। নৈতিক মূল্য ও অনৈতিক মূল্য বলতে কী বুঝায়?
৩. মূল্যের যে কোন চারটি শ্রেণির তুলনামূলক আলোচনা করুন। চরম মূল্য আসলে কী?

পাঠ- ১.৭: কল্যাণ ও অকল্যাণের স্বরূপ ও সমাধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কল্যাণ ও অকল্যাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জাগতিক অকল্যাণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নৈতিক অকল্যাণ কী তা বলতে পারবেন।

আস্তিক দার্শনিকগণ সাধারণত এই মত পোষণ করেন যে, এই জগত নৈতিক শাসক ও নৈতিক বিধাতার অধীন। যে বিধাতা সবচেয়ে বিজ্ঞ ও পবিত্র এবং যার ফলে তিনি একাধারে পরম ন্যায়বান, কল্যাণময় ও সর্বশক্তিমান।

যাবতীয় অকল্যাণকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, জাগতিক অকল্যাণ ও নৈতিক অকল্যাণ। জাগতিক অকল্যাণ বলতে আমরা জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, মহামারী সাইক্লোন, হ্যারিকেন প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির ধ্বংস-লীলাকে বুঝে থাকি। ব্যাপক অর্থে, নৈতিক অকল্যাণ বলতে আমরা অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, ব্যভিচার, শোষণ, জাতিতে জাতিতে কোন্দল, হানাহানি প্রভৃতি ধরনের নৈতিক পাপ বা অকল্যাণকে বুঝি। এখন ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাথে অকল্যাণের সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে সম্ভব হতে পারে। সে বিষয়ে জাগতিক অকল্যাণ ও নৈতিক অকল্যাণের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মত নিচে আলোচনা করা হলো।

জাগতিক অকল্যাণের ব্যাখ্যা

১. সাধারণ মানুষ মনে করে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অকল্যাণ ঈশ্বরের ইচ্ছার সৃষ্টি। ঈশ্বর তাঁর শক্তি প্রকাশ করার বা পাপীদের শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে এসব অকল্যাণের সৃষ্টি করেন। আবার, অনেক ধর্মভীরু মানুষ প্রাকৃতিক দুযোর্গ ও অকল্যাণকে ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নেন। আবার, অনেকে জাগতিক অকল্যাণকে অশুভ শক্তি বা শয়তানের কৃতকর্মের ফল বলে মনে করেন। মানুষ ইচ্ছা করলে এই অকল্যাণকে দূরীভূত করতে পারেন এবং জীবনকে সুখময় করতে পারেন।

২. নৈরাশ্যবাদীরা মনে করেন যে, এই জগতে যেহেতু অকল্যাণের লীলা-খেলা দেখা যায়, সেহেতু এই জগতে সুখের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বর্জন করা ছাড়া উপায় নেই। কেননা এই জগতে সুখের পেছনে ধাওয়া করার অর্থই দুঃখ-কষ্টের সন্ধান পাওয়া এবং তাই দুঃখ-কষ্ট একমাত্র জাগতিক সম্পদ। বুদ্ধ, ওমর খাইয়াম, আর্নল্ড, শেলী, হার্টম্যান, স্পেঙ্গলার প্রমুখ চিন্তাবিদেরা নৈরাশ্যবাদের প্রধান সমর্থক।

৩. আবার রুশো, রবীন্দ্রনাথ, আলেকজান্ডার, পোপ, ব্রুনো, বার্কলি প্রমুখ আশাবাদীরা মনে করেন যে, জাগতিক অকল্যাণের মধ্যেই লুকায়িত রয়েছে আসল সুখ বা শান্তি। তাই তাঁরা এই জগতে সব সময় সুখের সন্ধান পান। দার্শনিক লাইবনিজ আশাবাদের একজন প্রধান সমর্থক। লাইবনিজের মতে, এই জগত হলো সুন্দর ও সুখময় জগত। তাঁর মতে, দুঃখ-কষ্ট সাময়িকভাবে অকল্যাণ বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে নৈতিক শিক্ষা ও আদর্শ লাভের জন্য এটা একটা উপকরণমাত্র। তাই এই জগত অকল্যাণ বা দুঃখ-কষ্টের জগত নয়, বরং এ জগত কল্যাণ বা শান্তির জগত।

৪. নৈরাশ্যবাদী ও আশাবাদীদের চরম ও উগ্র মতাবদের মূল বিতর্ক বা দ্বন্দ্বের সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে সাম্প্রতিক দর্শনে উন্নতি সাধনবাদ গড়ে উঠে। এ মতবাদের প্রধান সমর্থক উইলিয়াম জেমস, এইচ. জি. ওয়েলস এবং পেরী। এ মতবাদ অনুসারে জগত খুব নিরাশার জগতও নয়, বা খুব আশার জগতও নয়, বরং এই জগত নিরাশা ও আশার দ্বন্দ্বকে সমন্বয় করে ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। মানুষ শুধু এই

জাগতিক অকল্যাণকে তার সুষ্ঠু ও বিজ্ঞ পরিকল্পনা এবং কর্মের মাধ্যমে দূর করতে পারে না, তাই নয়, নৈতিক অকল্যাণকেও দূরীভূত করতে পারে।

৫. দ্বৈতবাদ অনুসারে জড় নিষ্ক্রিয় এবং এই জড় ঈশ্বরের কাজে ব্যাঘাত ঘটায় বলে জগতে অকল্যাণের সৃষ্টি হয়। প্লেটোর দ্বৈতবাদে বলা হয় যে, সব মঙ্গল বা শুভই 'মঙ্গলের ধারণা'-র কাছে থাকে। অ্যারিস্টটলের দ্বৈতবাদেও বলা হয় যে, কল্যাণই ঈশ্বরের কাছে থাকে এবং সব অকল্যাণ জড়ের মধ্যে থাকে।

৬. দ্বিশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সর্বকল্যাণময়। তিনি সত্যকে মিথ্যার উপর বা কল্যাণকে অকল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠা করতে সব সময় অকল্যাণের প্রতীক বা সত্তার সাথে সংগ্রাম করে থাকেন। কিন্তু সব সময় ঈশ্বর এই সংগ্রামে সফল হয় না বলেই জগতে অকল্যাণের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৭. অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করার পরে কতকগুলা শক্তি সৃষ্টি করেন, যারা জগত থেকে ঈশ্বরের অবর্তমানে বা অতিবর্তী হওয়ার ফলে জগতকে পরিচালনা করে। ঈশ্বর জগত থেকে মুক্ত বা স্বাধীন থাকেন। জগত এসব শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলার সময় অনেক সময় জাগতিক অকল্যাণ সাধিত হয় বলে ঈশ্বর জাগতিক অকল্যাণের জন্য দায়ী নন।

৮. সর্বেশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বরই সব এবং সবই ঈশ্বর, অর্থাৎ ঈশ্বরই একমাত্র সত্য এবং জগত মিথ্যা। জগত যেহেতু মিথ্যা, সেহেতু জাগতিক অকল্যাণ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।

৯. ঈশ্বরবাদ অনুসারে জগত অসীম ঈশ্বরের সসীম প্রকাশ এবং জাগতিক অকল্যাণ সসীম জগতের সৃষ্টি। জাগতিক অকল্যাণ যদিও অগ্রগতির পথে বাধা হলেও তা প্রকৃত কৃতিত্ব ও গৌরব লাভের সহায়ক। মার্টিনিউ-র মতে, ঈশ্বর অকল্যাণের কথা স্বীকার করেন কেবল নৈতিকতাকে সম্ভব করে তোলার জন্য এবং সে হিসেবে এই জগতের অকল্যাণের অস্তিত্ব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

১০. সর্বধরেশ্বরবাদের প্রধান প্রবক্তা হেগেলের মতে, অকল্যাণ মায়া নয়, বরং এ হলো আপেক্ষিক ও শর্ত সূচক। আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও অম্পূর্ণতার জন্যই আমরা জাগতিক বস্তুকে অকল্যাণ বলে মনে করি। কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জাগতিক বস্তুকে দেখার চেষ্টা করলে দেখা যায়, 'যা বাস্তব, তাই বৌদ্ধিক এবং যা বৌদ্ধিক, তাই বাস্তব'। অর্থাৎ জগতের সব কিছুই তার স্ব-স্ব স্থানে বা সমগ্রের ক্ষেত্রে কল্যাণরূপেই বিরাজিত। তথাকথিত অকল্যাণ ও অসম্পূর্ণতা এক অনন্ত বিবর্তন পদ্ধতির কতকগুলো অপরিহার্য অংশ মাত্র। তাই সমগ্রই একমাত্র সত্যিকারের কল্যাণ এবং এই সামগ্রিক কল্যাণের কাছে অকল্যাণ একটা উপায় মাত্র। যোশিরা রয়েসও বলেন যে, কল্যাণের বিজয়ের জন্য অকল্যাণের প্রয়োজন।

নৈতিক অকল্যাণের ব্যাখ্যা

জাগতিক অকল্যাণের ব্যাখ্যার মতো নৈতিক অকল্যাণের বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. ধার্মিকদের মতে, নৈতিক অকল্যাণ দূরীভূত করার জন্য বা অশুভ শক্তি বা শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঈশ্বর মানুষকে যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়েছেন। মানুষ যদি এই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে, তাহলে অশুভ শক্তিরই বিজয় হয়, অর্থাৎ নৈতিক অকল্যাণ সাধিত হয়। এই নৈতিক অকল্যাণের ফলেই মানুষকে পরকালে কষ্ট ভোগ করতে হয়। তাই নৈতিক অকল্যাণের জন্য ঈশ্বর দায়ী নয়, বরং মানুষই দায়ী।

২. সর্বেশ্বরবাদ জগতকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করার ফলে জাগতিক অকল্যাণের মেন কোন অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করার ফলে নৈতিক অকল্যাণেরও কোন অস্তিত্ব সর্বেশ্বরবাদে পাওয়া যায় না। তাই সর্বেশ্বরবাদ অনুসারে জাগতিক অকল্যাণের মতো নৈতিক অকল্যাণও একটা মায়া মাত্র।

৩. অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ, ঈশ্বরবাদ ও সর্বধরেশ্বরবাদ মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করে বলে নৈতিক অকল্যাণের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। এসব মতবাদ অনুসরে নৈতিক অকল্যাণ হলো মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার

অপপ্রয়োগ বা স্বেচ্ছাচারিতার ফলমাত্র। ইচ্ছার স্বাধীনতার জন্যই মানুষ মানবেতর প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র ও উচ্চস্তরের বুদ্ধি সম্পন্ন জীব। ঈশ্বর কোন নৈতিক অকল্যাণ সৃষ্টি করেন নি, বরং এই নৈতিক অকল্যাণ মানুষেরই সৃষ্টি।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জাগতিক ও নৈতিক অকল্যাণের বাখ্যা দিয়েছেন ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং ফলে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৭

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অকল্যাণকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়?
   ক. দুইভাগে
   খ. পাঁচভাগে
   গ. তিনভাগে
   ঘ. চারভাগে

২. জাগতিক অকল্যাণ বলতে কী বুঝায়?
   ক. ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, মহামারী প্রভৃতি
   খ. অসুখ-বিসুখ
   গ. মানব সৃষ্ট ফেৎনা ফ্যাসাদ
   ঘ. মারামারি, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি

৩. নৈরাশ্যবাদীরা জগতকে কী মনে করেন?
   ক. কল্যাণের ভূমি
   খ. শান্তির ভূমি
   গ. অশান্তির ভূমি
   ঘ. অকল্যাণের লীলাভূমি

উত্তরমালাঃ ১. ক, ২. ক, ৩. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. অকল্যাণ সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী কী মত পোষণ করেন?
২. ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদীগণ কোন ধরনের অকল্যাণের ধারণা পোষণ করেন?
৩. নৈরাশ্যবাদ ও আশাবাদ এর পার্থক্য তুলে ধরুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. কল্যাণ অকল্যাণের কারণ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।
২. জাগতিক অকল্যাণের সংজ্ঞা দিন। এ বিষয়ে বিভিন্ন মতাদর্শ তুলে ধরুন।
৩. নৈতিক অকল্যাণ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন।